শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

Shrimp Culture and Breeding-1

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৯৯১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

// জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মো: শরীফ উদ্দিন
প্রফেসর ড. এ কে এম আজাদ শাহ
ড. মোহা: সাইনার আলম
হাসনাত জাহান
মো: আসাদুজ্জামান
ড. আনিচুর রহমান মৃধা
ড. ইন্দ্রানী ধর (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০২৩
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং -১

(নবম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ, বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পরিচিতি ও বাগদা চিংড়ির জীববিদ্যা	১-৩৯
দ্বিতীয়	বাগদা চিংড়ির খামার ব্যবস্থাপনা	৪০-১১৫
তৃতীয়	বাগদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১১৬-১৩৭
চতুর্থ	বাগদা চিংড়ি আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ	১৩৮-১৯০

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ, বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পরিচিতি ও বাগদা চিংড়ির জীববিদ্যা

Shrimp Resources of Bangladesh, Introduction to different Shrimp Species and Biology of Bagda Shrimp



মৎস্য খাতের মধ্যে চিংড়ি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বে জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে চিংড়ি বেশ সমাদৃত, ফলে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে।

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ক্লাস্টার পদ্ধতিতে প্রদর্শনী খামার পরিচালনা, উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ২০২২ সালে একটি অন্যতম ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।
- চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি শনাক্ত করতে পারব।
- চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় শনাক্ত করতে পারব।
- বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ি শনাক্ত করতে পারব।

১.১। বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সুফলভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২০২২-২৩ সালের তথ্যমতে জলজসম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে বদ্ধ জলাশয় আছে প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর এবং মুক্ত জলাশয় রয়েছে প্রায় ৩৮.০ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার তটরেখার কাছাকাছি বেইজলাইন থেকে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামুদ্রিক জলসম্পদ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ দেশের স্বাদুপানিতে ২৪ প্রজাতির চিংড়ি ও লোনা পানিতে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। মৎস অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর ২০২২-২৩ সালের তথ্যমতে দেশের জলজসম্পদ ও মাছের উৎপাদন নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আধা লোনা বা স্বল্প লোনাপানিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয় । এ অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুণাবলি বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য বেশ উপযোগী । চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে- অভ্যন্তরীণ জলজসম্পদ ও সামুদ্রিক এলাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পোস্ট লার্ভার (পিএল) পরিচর্যার মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

সারণি: ২০২২-২৩ বছরে জলজসম্পদ ভিত্তিক মাছের উৎপাদন

মৎস্য খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
১. অভ্যন্তরীণ (ক) মুক্ত জলাশয়		
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	৩.৮৯
সুন্দরবন	১.৭৮	০.২৬
বিল	১.১৪	১.০৯
কাপ্তাই লেক	০.৬৯	০.১৭
প্লাবনভূমি	২৬.৪৬	৮.৪২
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৩৮.৬১	১৩.৮৩
(খ) চাষকৃত		
পুকুর	৪.১৬	২২.৭৩
আধাবদ্ধ মৌসুমী জলাশয়	১.৪৫	২.৩২
বাঁওড়	০.০৬	০.১২
চিংড়ি খামার	২.৬২	৩.০১
কাঁকড়া চাষ	০.০৯	০.১৩
পেন কালচার	০.০৯	০.১৬
কেজ কালচার	০.০০১	০.০৫
উপ-মোট (বদ্ধ জলাশয়)	৮.৪৭	২৮.৫২
মোট (অভ্যন্তরীণ)	৪৭.০৭	৪২.৩৫
২. সামুদ্রিক		
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		১.৪৬
(খ) আর্টিসেনাল		৫.৩৩
মোট (সামুদ্রিক)	-	৬.৭৯
সর্বমোট	-	৪৯.১৪

সুত্র: এফআরএসএস ২০২২-২৩, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ



চিত্র- ১.১: উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আদর্শ চিংড়ি ঘের

উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১,৭০,০০০ হেক্টর জমিতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ির চাষ হচ্ছে। সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার এলাকায় বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমানে এ ৪টি জেলার বিভিন্ন এলাকায় আধা-নিবিড় এবং নিবিড় পদ্ধতির চিংড়ি খামার গড়ে উঠছে এবং প্রতি নিয়ত বাগদা চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৮ মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধনের সাথে সাথে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, উন্নত মানের পিএল উৎপাদন ও সরবরাহ, সময়মত লবণপানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং বিশ্ব বাজারে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য গুণগত মানসম্পন্ন বাগদা উৎপাদন এবং লাগসই বিপণনের ব্যবস্থা প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী।

চিংড়ি সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদ বাংলাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি একটি বর্ধনশীল শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের দিকে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে চিংড়ির উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বেড়ি বাঁধের অভ্যন্তরে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। তবে এর পূর্বেও বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হত। চাষ প্রযুক্তি হিসেবে খামারের অভ্যন্তরে উপযুক্ত সময় অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ও প্রতিপালিত অধিক পোনা সমৃদ্ধ মোহনা অঞ্চলের পানি নালা কেটে প্রবেশ করিয়ে চিংড়ির পোনা পালনের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। খামারে নির্দিষ্টভাবে বা নির্দিষ্ট সংখ্যক পোনা মজুদ না করে মূলত জোয়ারের পানির সাথে ভেসে আসা পোনা সংরক্ষণের মাধ্যমেই চিংড়ি চাষ করা হতো। এ কাজের জন্য বাগদা চিংড়ির প্রজনন মৌসুমে (মার্চ-নভেম্বর) পূর্ণিমার সময়ে জোয়ারের পানি খামারে প্রবেশ করিয়ে তিন-চার মাস পর খামারের পানি বের করে দিয়ে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ আহরণ করা হতো। এ সময়ে প্রতি উৎপাদন চক্রে হেক্টর প্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ২০ থেকে ৫০ কেজি।

সত্তর দশকের শেষের দিকে খুলনা অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলাধীন সদর, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। অধিক লাভজনক শিল্প হিসেবে চিংড়ি সম্পদ জনসাধারণের কাছে বিবেচিত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে চিংড়ির চাষ খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও যশোর অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার লাভ করে।

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষে মোট জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫২ হাজার হেক্টর এবং হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ৮৫ কেজি/উৎপাদন চক্র। পঞ্চাশ দশকের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাদুপানিতে গলদা চিংড়ির চাষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুরু হলেও আমাদের দেশে শুরু হয় সত্তর দশকের শেষ দিকে। এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জাপান, হাওয়াই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ানে গলদা চিংড়ি চাষের ওপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পূর্বে গলদা চিংড়ির চাষের কোনো স্বতন্ত্র এলাকা ছিল না বললেই চলে এবং বাগদা চিংড়ি মাত্র আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হত। এ সময় গলদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ১০০ কেজি। বাংলাদেশে সমগ্র উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চিংড়ি চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে মূলত আশি থেকে নব্বই দশকের দিকে। বর্তমানে বেশিরভাগ খামারে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে অনেকটা উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে চিংড়ি চাষাবাদ হচ্ছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি শিল্পের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান প্রায় ৭০ শতাংশ। বাংলাদেশে এ শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেমন- আহরণ, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ রপ্তানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য মৎস্য বিষয়ক সহায়ক কাজে নিয়োজিত।

বাংলাদেশ হতে মোট রপ্তানির প্রায় ৯৫ শতাংশ চিংড়ি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে রপ্তানি করা হয়। বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ এবং অর্জিত আয় প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে হিমায়িত কারখানার সংখ্যা ৯৭ থাকলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৩টি। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারিভাবে হ্যাচারির সংখ্যা ও চিংড়ি খাদ্য কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শতাব্দীকাল থেকেই আমাদের দেশের চিংড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত-পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সম্পদের গুরুত্ব আজ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। উপকূলীয় এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ বছরের প্রায় ৬ থেকে ৮ মাস বাগদা চিংড়ির পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত। এক গবেষণায় দেখা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক পরিবারের ৭০-৭৫ শতাংশ সদস্য পোনা ধরার মৌসুমে পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কাজেই বলা যায়, পোনা সংগ্রহের ফলে দুস্থ বিধবা মহিলারা অনেকাংশেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ থেকে এই অতিরিক্ত আয়ের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে টেকসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গবেষণা ও ফলাফল প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে।

চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে সমস্যা

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে লবণাক্ত পানি প্রধান উৎপাদন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। চিংড়ি চাষের অন্যান্য উপকরণসমূহের মধ্যে চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা, সম্পূরক খাদ্য ও লাগসই প্রযুক্তি অন্যতম। চিংড়ি উৎপাদনে চিংড়ির জীব-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের সংরক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে উপরোক্ত উৎপাদন উপকরণ সমূহের সমন্বয়ের অভাব ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতির উপর প্রযুক্তিগত ধারণা না থাকার কারণেই বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিচে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চিংড়ি উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

ক. সামাজিক সমস্যা: চিংড়ির অর্থনৈতিক মূল্য বেশি ও চিংড়ি ধরা সহজ হওয়ার কারণে চিংড়ি চাষ এলাকায় সামাজিক সমস্যাও বেশি। ফলে অনেক সময় অধিকাংশ চাষি ও উদ্যোক্তার চিংড়ি চাষে আগ্রহ কমে যায়। চিংড়ি চাষ ব্যয়বহুল হওয়ার সাথে সাথে আয়ের হার বেশি হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার মহাজন বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ চিংড়ি চাষে সংশ্লিষ্ট এলাকার দরিদ্র চিংড়ি চাষিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে দরিদ্র চাষিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। এছাড়াও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। চিংড়ি চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, দ্রুত ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা, জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে জটিলতা ইত্যাদি অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

খ. পরিবেশগত সমস্যা: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিকল্পিতভাবে লোনা পানির চিংড়ি চাষ করার ফলে নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে অনেক সময় উপকূলীয় বন ভূমি, কৃষি জমি ও পানীয় জলের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য ও গোচারণ ভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্রও নষ্ট হচ্ছে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে।

গ. প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা: সত্তরের দশকে আমাদের দেশে চিংড়ির চাষ শুরু হলেও এখনো আধুনিক চাষ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো চিংড়ি চাষের ওপর সাধারণ চাষিদের মাঝে প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার অভাব, আধানিবিড় বা নিবিড় চাষ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, সময়মত চিংড়ির পোনার অভাবে চিংড়ি খামারে পরিমিত পোনা মজুদ না করা, ইত্যাদি।

ঘ. চিংড়ি বিপণনগত সমস্যা: আমাদের দেশে এখনও চিংড়ি সম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি বললেই চলে। মূলত চিংড়ি উৎপাদনকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা, সংরক্ষণ সুযোগ সুবিধা ও মধ্য সুবিধাভোগীদের (ফড়িয়া, আড়তদার ও ব্যাপারি) উপর ভিত্তি করে এ বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। খুব কম পরিমাণ চিংড়িই উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রেতার হাতে পৌঁছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে বাজারে আসে। বর্তমানে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় রপ্তানি একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশও ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল ক্রেতার চাহিদানুযায়ী চিংড়ির গুণগতমান উন্নতকরণের জন্য চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যক্ষম করা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়া

বাস্তবায়নে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যক্ষম করা একান্ত অপরিহার্য। চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিংড়ি বিপণন নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.৫ চিংড়ি চাষ উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন উপকরণসমূহের অপ্রতুলতাসহ বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হলেও চিংড়ি চাষ উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কতিপয় সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) স্থিতিশীলভাবে চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে খামারে প্রতি বর্গমিটারে ১৫ টির অধিক বাগদা এবং ৮টির অধিক গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা উচিত নয়।

খ) প্রতিটি ফসল তোলার পর বা চিংড়ি আহরণের পর রোগ প্রতিরোধের জন্য চিংড়ির খামারের তলদেশে সঞ্চিত কালো মাটি বা বর্জ্য পদার্থ তুলে ফেলে পরবর্তী চাষের পুর্বে লাঙ্গল দিয়ে চাষ দেয়া।

গ) আধানিবিড় খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্যাডেল চালিত বায়ু সঞ্চালন যন্ত্রের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে খামারের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এলাকা পরিষ্কার করা যায় এবং অক্সিজেনজনিত সমস্যা না হয়।

ঘ) খামারের পানির পিএইচ ৭.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে রাখা উচিত এবং প্রতিদিন পানির পিএইচ- এর পরিবর্তন বা উঠানামা ০.৪ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোঅক্সাইডের পরিবর্তে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই পানি এবং মাটির পিএইচ পরিমাপ করা।

ঙ) চিংড়ি পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারি স্থাপন কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এবং এ প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এলাকায় বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করাসহ হ্যাচারি মালিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

চ) উৎপাদনকারীদের নিকট প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- খাবার, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, চা বীজের খৈল ও রোটেননসহ অন্যান্য জীবাণুনাশকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ছ) চিংড়ি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বায়ু সঞ্চালন যন্ত্র, পাম্প ও খামারের অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের জন্য সরকারি পর্যায় থেকে উৎসাহিত করা।

জ) মাঠ পর্যায়ে চিংড়ি চাষিসহ বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।

ঝ) চিংড়ি চাষের বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগীদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা/ কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন করা।

ঞ) চিংড়ি চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্ভূত সমস্যার আশু সমাধানকল্পে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফল দ্রুত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ট) আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে অভীষ্ট এলাকার কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

ঠ) চিংড়ি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী স্বাদুপানির শামুক ও ঝিনুকের অনিয়ন্ত্রিত আহরণ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ড) বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের সময় যাতে অন্যান্য মাছের বা প্রাণীর পোনা নষ্ট না হয়, সেজন্য চিংড়ির পোনা আহরণকারীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং চিংড়ির পোনা আহরণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় অধিক স্থায়িত্বশীল সমন্বিত চিংড়ি চাষের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

ঢ) অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করার লক্ষ্যে সকল চিংড়ি খামার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদিকে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। তাছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।

ণ) চিংড়ি চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে আগ্রহী চাষিদের নিকট সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

১.২ বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পরিচিতি

নিচে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোনা ও স্বাদুপানির চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান ও পরিচিতি বর্ণনা করা হলো:

বাগদা চিংড়ি *(Penaeus monodon)*: বাগদা চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান মূলত বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল, যেমন–বাগেরহাটের উর্ধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, খুলনার পশুর নদীর মুখে নিম্ন মোহনা, পটুয়াখালীর রাঙাবালী, খেপুপাড়া মোহনা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা এবং বঙ্গোপসাগর। তাছাড়া ভোলা জেলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলা সংলগ্ন মেঘনা নদী ও বুড়গৌরাঙ্গা নদীর মোহনায় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিত সাগরে এদের পাওয়া যায়।

বাগদা চিংড়ি দেখতে বাদামি থেকে সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এদের গায়ে বাঘের মত কালচে ডোরাকাটা দাগ থাকে বলে এদেরকে জায়ান্ট টাইগার শ্রিম্প (giant tiger shrimp) বলা হয়। এই চিংড়ির ইউরোপডে দু'টি ঘন নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ থাকে। বাগদা চিংড়ির পোনার দেহের সম্মুখভাগ থেকে পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত লাল রেখা দেখা যায়। রোস্ট্রাম বাঁকা ও প্রশস্ত এবং দেখতে অনেকটা তরবারীর মত। রোস্ট্রামের উপরের দিকে ৭-৮টি ও নিচের দিকে ৩-৪টি দাঁত থাকে। টেলসন খাঁজযুক্ত, যকৃত দেশিয় কেরিনা সোজা আকৃতির এবং ৫ম পেরিওপডে এক্সোপোডাইট নেই।



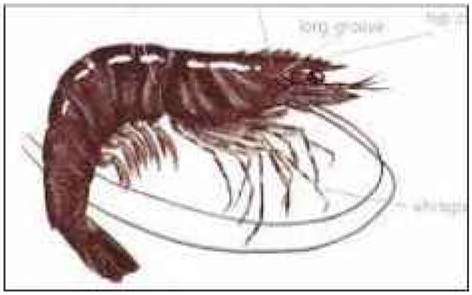


চিত্র-১.২: বাগদা চিংড়ি

চাকা চিংড়ি (*Penaeus indicus*): বাংলাদেশের খুলনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার ও বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। গালফ অফ এডেন, মাদাগাস্কার, আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিউগিনি, ভারত ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় এই চিংড়ি দেখা যায়। চাকা চিংড়ির দেহে হালকা বাদামী রঙের ফোটা ফোটা দাগ থাকে। এর রোস্ট্রাম খাড়া ও বাঁকা। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১০টি এবং নিচের দিকে ৪-৬টি দাঁত থাকে। শুঁড় বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। পা কখনও কখনও লালচে বর্ণের হয়ে থাকে ।



চিত্র- ১.৩: চাকা চিংড়ি



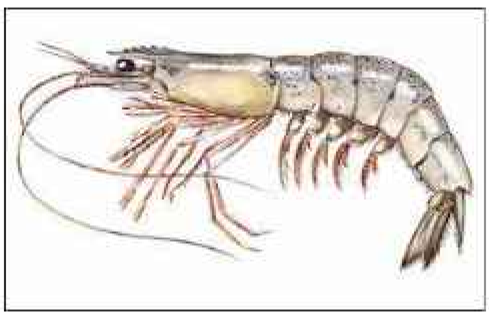
চিত্র- ১.৪: বাগতারা চিংড়ি

বাগতারা চিংড়ি (*Penaeus semisulcatus*): বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন মোহনা অঞ্চল এবং পটুয়াখালী জেলায় এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়ায় উত্তরাঞ্চল, ফিলিপাইন, ভারতের পূর্ব উপকুল, নিউগিনি ও মালয়েশিয়াতে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। এই চিংড়ি দেখতে অনেকটা হালকা সবুজ বর্ণের এবং এদের দেহে অসংখ্য বাদামি রঙের ফোঁটা দাগ থাকে। রোস্ট্রামের দুই পাশে ভাঁজ দেখা যায়। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৮টি এবং নিচের দিকে ৩টি দাঁত থাকে। এদের পঞ্চম চলন পদে ছোট এক্সোপোডাইট বর্তমান।

হরিণা চিংড়ি (*Melapenaeus monoceros*): হরিণা চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। সাধারণত সমুদ্রের ১০-৩০ মিটার গভীরে এদের বিচরণক্ষেত্র। বাগেরহাটের উর্ধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, কুমারখালী মোহনা, ডুবলা, চরচাপলি, খুলনার পশুর নদীর মুখে নিম্ন মোহনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগর এলাকা এই চিংড়ির বিচরণ ক্ষেত্র। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর, মালয়েশিয়া, মালাক্কা প্রণালী ও ভারতের সমগ্র সমুদ্র উপকুল এলাকায় এদের পাওয়া যায়। এই চিংড়ির রোস্ট্রাম সোজা এবং শুঙ্গ বাগামি রঙের হয়ে থাকে। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১২টি খাঁজ থাকে এবং নিচের ভাগে কোনো খাঁজ থাকে না। ফ্লাজেলা উজ্জ্বল লাল রঙের এ কারণে এদেরকে হরিণা চিংড়ি বলে। ইউরোপড হালকা লাল বর্ণের হয়ে থাকে।



চিত্র- ১.৫: হরিণা চিংড়ি

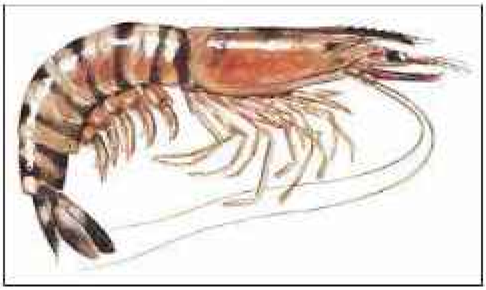


চিত্র- ১.৬: হন্নি চিংড়ি

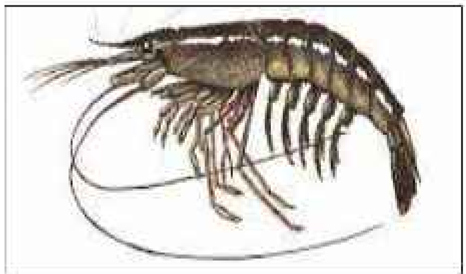
২০২৫

হরিণা চিংড়ি (*Metapenaeus brevicornis*): বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, কক্সবাজার ও চট্টগামের মোহনা অঞ্চলে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের সমুদ্র উপকূলে এদের পাওয়া যায়। পকিস্তান ও ভারতে এটি বাণিজ্যিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ি। আঁশযুক্ত দেহের উপরিভাগে বাদামি ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে এবং এই ফোঁটা দাগ লেজের দিকে বেশি থাকে। রোস্ট্রামের পিছনের অংশে উঁচু শৃঙ্গ বা ঝুঁটি থাকে। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৭টি দাঁত থাকে কিন্তু নিচের দিকে কোনো দাঁত থাকে না।

ডোরাকাটা চিংড়ি (*Penaeus japonicus*): গভীর সমুদ্রে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে ০-৯০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এই চিংড়ি পাওয়া যায়। জাপান, ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকা, আফ্রিকা ও ভারতে এই ডোরা কাটা চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই চিংড়ির দেহে ডোরাকাটা দাগ থাকে। রোস্ট্রাম সোজা ও রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯-১০টি এবং নিচের দিকে ১টি দাঁত থাকে। স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামের সম্মুখ অংশের মাথা গোলাকার।



চিত্র- ১.৭: ডোরাকাটা চিংড়ি



চিত্র- ১.৮: বাঘাতারা চিংড়ি

বাঘাতারা চিংড়ি (*Parapenaeopsis stylifera*): বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী এলাকা এবং সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্ন মোহনায় এই চিংড়ি পাওয়া যায়। তাছাড়া কুয়েত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভারত, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়াও এদের বিচরণ এলাকা। এই চিংড়ির রোস্ট্রাম ও উদর খন্ডে ছাই রঙের আড়াআড়ি দাগ বিদ্যমান। টেলসন ও লেজে পাখনা এবং বক্ষ ও সন্তরণ পদ লাল রঙের হয়ে থাকে। খাটো রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৭-৯টি দাঁত থাকে।

বাঘাচামা চিংড়ি (*Penaeus hierguensis*): ঈষৎ লবণাক্ত পানি ও লোনা পানিতে বাঘামাচা চিংড়ি বাস করে। সমুদ্রের ১০-৪৫ মিটার পানির গভীরে এদের পাওয়া যায়। বৃহত্তর খুলনা ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্ন মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরে বাঘাচামা চিংড়ি পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীন সাগর, মালয় আর্কিপেলাগো, অস্ট্রেলিয়া, এরাবিয়ান গালফ, পাকিস্তান ও ভারত এদের বিচরণ ক্ষেত্র। এই চিংড়ির গায়ের রং সাদাটে। রোস্ট্রাম শৃঙ্গ ত্রিকোণাকৃতির। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৬-৭টি এবং নিচের দিকে ২-৪টি দাঁত থাকে।

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*): বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের হালদা নদী ও ভোলা জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূল, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চল, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশ, পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, শ্রীলংকা ও মায়ানমারে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। এছাড়াও পশ্চিম গোলার্ধের ইন্দো ডেলটা এলাকায় এদের পাওয়া যায়।

গলদা চিংড়ি দেখতে সাধারণত হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। উদর খোলসের সংযোগস্থলে নীল বন্ধনী থাকে। এই চিংড়ির ক্যারাপেসের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি লম্বা দাগ দেখা যায়। রোস্ট্রাম লম্বা ও বাঁকানো। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১১-১৪টি এবং নিচের অংশে ৮-১৪টি খাঁজ বা দাঁত থাকে। অন্যান্য চিংড়ির তুলনায় গলদা চিংড়ির শিরোবক্ষ (cephalothrorax) অংশ বেশ বড়। এই চিংড়ির দ্বিতীয় চলনপদ তুলনামূলকভাবে বড় এবং নীল ও কিছুটা কালচে রঙের হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ির উদরের দ্বিতীয় প্লিউরা প্রথম ও তৃতীয় প্লিউরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে। ব্রাঙ্কিওস্টিগেল কাঁটা নেই, তবে যকৃত কাঁটা আছে।



চিত্র ১.৯: গলদা চিংড়ি

ছটকা চিংড়ি (*Macrobrachuum malcolmsonii*): বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নরসিংদী, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, ফেনী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, বার্মা ও বোর্ণিওতে এই ছটকা চিংড়ি পাওয়া যায়। এই চিংড়ির পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশ হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। দেহে বাদামি কিংবা কমলা বর্ণের ফ্যাকাশে হালকা টান টান দাগ থাকে। রোস্ট্রামের গোড়া উত্তল এবং রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯-১৪টি ও নিচের দিকে ৫-৯টি দাঁত থাকে। দ্বিতীয় চলন পদের কারপাস চিলার চেয়ে ছোট।

১০২৫



চিত্র- ১.১০: ছটকা চিংড়ি

ডিমুয়া চিংড়ি *(Macrobrachium villosimanus)*: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী এদের বিচরণ এলাকা। এছাড়া ভারত ও বার্মায় এদের পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং স্বচ্ছ এবং ফ্লাজেলার অগ্রভাগ বাদামি লালচে রঙের। বাঁকানো ও সুদৃঢ় রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১২-১৩টি এবং নিচের দিকে ৮-৯টি দাঁত থাকে।

শুল চিংড়ি *(Macrobrachiurn birmanicum)*: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র কমবেশি এই চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শুল চিংড়ি পাওয়া যায়। মিঠাপানির এই চিংড়ির গায়ের রং হলদে সবুজ, বক্ষ হালকা নীলাভ রঙের এবং সন্তরণ পদ নীলাভ রঙের হয়ে থাকে। ছোট ও উত্তল রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১৪টি এবং নিচের অংশে ৪-৬টি দাঁত থাকে।

গোদা চিংড়ি *(Macrobrachium rude)*: বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের হালদা নদীতে পাওয়া যায়। ভারত, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও শ্রীলংকাও এদের বিচরণ এলাকা।



চিত্র- ১.১১: গোদা চিংড়ি



চিত্র- ১.১২: চিকনা চিংড়ি

চিকনা চিংড়ি (*Macrobrachium idella*): বাংলাদেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, মালয় আর্কিপেলাগো, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মোহনা ও নদীতে বিশেষ করে পূর্ব সমুদ্র উপকূল এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

লটিকা চিংড়ি (*Macrobrachium mirabile*) : বাংলাদেশের মেঘনা নদী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলে এই চিংড়ি বাস করে। ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চল, মায়ানমার, মালয়েশিয়া ও বোর্ণিওতে পাওয়া যায়।

লালিয়া চিংড়ি (*Metapenaeus spinulatus*): লোনাপানির এই চিংড়ি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন উপকুলীয় এলাকা, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি ও খেপুপাড়া মোহনা এবং চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকুলীয় অঞ্চলসহ বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। এই চিংড়ির রোস্ট্রাম উত্তল ও অগ্রভাগ সুঁচালো। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৬টি দাঁত থাকে। এন্টিনাল স্পাইন হেপাটিক স্পাইনের চেয়ে ছোট আকৃতির এবং টেলসনের পার্শ্বে দুই জোড়া স্পাইন থাকে। এই চিংড়ির এন্টিনিউলার ফ্লাজেলা ক্যারাপেসের চেয়ে লম্বা হয়ে থাকে।

সারণি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন চিংড়ির নাম

ক্রমিক	স্থানীয়/বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম
০১.	গলদা চিংড়ি, বড় ইচা, গলদা ইচা	*Macrobrachium rosenbergii*	Fresh water giant prawn
০২.	ছটকা চিংড়ি, ছোট গলদা, বাঁটি গলদা	*Macrobrachium malacolmsonii*	Mon soon river prawn
০৩.	ডিমুয়া চিংড়ি, কাঠালিয়া ইচা	*Macrobrachium villosimanus*	Dimua river prawn
০৪.	গন্দল চিংড়ি, ঠেঙ্গা চিংড়ি, নজরী ইচা	*Macrobrachium birmanicum*	Birma river prawn
০৫.	গোদা চিংড়ি, পাইটা চিংড়ি	*Macrobrachium rude*	Fresh water giant prawn
০৬.	গেদা চিংড়ি, ব্রাহ্মনী চিংড়ি	*Macrobrachium dolichodactylus*	Fresh water giant prawn
০৭.	লটিয়া চিংড়ি, লইটা ইচা	*Macrobrachium mirabile*	Shortleg river prawn
০৮.	কুঞ্চ চিংড়ি, গুড়া ইচা	*Macrobrachium lamarrei*	Kuncho river prawn shrimp
০৯.	বাগদা চিংড়ি, বাগদা ইচা	*Penaeus monodon*	Giant/Jumbo tiger prawn
১০.	চাকা চিংড়ি, চাপদা চিংড়ি, চামা চিংড়ি, সাদা ইচা	*Penaeus inducus*	Indian white shrimp
১১.	বাগতারা চিংড়ি, হেড়ে বাগদা	*Penaeus semisulcatus*	Green tiger shrimp

২০১৫

১২.	ডোরোকাটা চিংড়ি, খুরমা চিংড়ি, জাপানি চিংড়ি	*Penaeus japonicus*	Kuruma shrimp
১৩.	চাপদা চিংড়ি, বড় চামা চিংড়ি	*Penaeus orientalis*	White shrimp
১৪.	বাগা চিংড়ি, কোরা চিংড়ি	*Penaeus merguiensis*	Banana shrimp
১৫.	লাল চামা ইচা, চামা ইচা	*Penaeus penicillatus*	Red tail shrimp
১৬.	হরিণা চিংড়ি, খরখরিয়া চিংড়ি	*Metapenaeus monoceros*	Yellow shrimp
১৭.	হন্নি চিংড়ি, সাগা চিংড়ি	*Metapenaeus brevicornis*	Kadal Shrimp
১৮.	লালিয়া চিংড়ি	*Metapenaeus spinulatus*	Brown shrimp
১৯.	কেরাণী চিংড়ি	*Metapenaeus affinis*	Indian brown shrimp/ Pink/ Ginga shrimp
২০.	কুচো চিংড়ি	*Metapenaeus lysianassa*	Bird shrimp

সারণি: গলদা ও বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক	গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি
০১.	বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় উদর খন্ডকের প্লিউরা ১ম ও ৩য় উদর মস্তকের প্লিউরাকে আংশিক আবৃত করে।	বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় উদর খন্ডকের প্লিউরা শুধুমাত্র ৩য় উদর মস্তকের প্লিউরাকে আংশিক আবৃত করে।
০২.	১ম দুইটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রুপান্তরিত হয় এবং ২য় চিলেট উপাঙ্গটি তুলনামুলকভাবে বড় হয়।	১ম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রুপান্তরিত হয়।
০৩.	শুক্রকীট স্থানান্তরের জন্য পুংজননাঙ্গ পেটাসমা বা স্ত্রী জননাঙ্গ থেলিকাম থাকে না।	শুক্রকীট স্থানান্তরের জন্য পুংজননাঙ্গ পেটাসমা বা স্ত্রী জননাঙ্গ থেলিকাম থাকে।
০৪.	স্ত্রী চিংড়ি ডিমগুলো গুচ্ছাকারে প্লিওপডের মাঝখানে বহন করে।	স্ত্রী চিংড়ি প্লিওপডে ডিম বহন করে না, বরং সরাসরি পানিতে ছাড়ে।
০৫.	মাথা দেহের ওজনের প্রায় অর্ধেক।	মাথা দেহের ওজনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ
০৬.	রোস্ট্রামের নিম্নাংশে দাঁতের সংখ্যা বেশি।	রোস্ট্রামের নিম্নাংশে দাঁতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
০৭.	আবাসস্থল মিঠাপানি, তবে প্রজননের সময় কিছু প্রজাতি ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে চলে আসে।	আবাসস্থল সমুদ্র এবং ঈষৎ লবণাক্ত পানি। প্রজননের সময় অধিকাংশ প্রজাতি সমুদ্রের লোনা পানিতে চলে যায় এবং লার্ভা অবস্থায় উপকুলীয় পানিতে চলে আসে।
০৮.	স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা আকারে বড় ও ওজনে বেশি হয়।	পুরুষের চেয়ে স্ত্রী বাগদা আকারে বড় হয় ও ওজনে বেশি।
০৯.	গলদা চিংড়ি মেরুদন্ডহীন মিঠাপানির বড় চিংড়ি।	বাগদা চিংড়ি মেরুদন্ডহীন লোনাপানির বড় চিংড়ি।

২০২৫

১.৩ বাগদা চিংড়ির জীববিদ্যা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন- জাপান, আমেরিকা, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে চিংড়ির সিস্টেমেটিক শ্রেণিবদ্ধতার ওপর ব্যাপক কাজ হয়েছে এবং নতুন নতুন চিংড়ি প্রজাতি শনাক্তকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে চিংড়ির সিস্টেমেটিক শ্রেণিবদ্ধকরণের উপর গবেষণা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। বাংলাদেশের মিঠাপানিতে ২৪টি ও লোনাপানিতে ৩৬টিসহ মোট ৬০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া গেলেও সারা বিশ্বে ৩৫১ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়। মিঠাপানির চিংড়ি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ জলাশয় যেমন- পুকুর-ডোবা, দিঘী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও নদীতে এবং লোনাপানির চিংড়ি খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলায় সাগরের লোনাপানি ও উপকূলীয় অঞ্চলের ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়।

বাগদা চিংড়ির বহিঃঅঙ্গসংস্থান গলদা চিংড়ির অনুরূপ। তবে বাগদা চিংড়ির প্রথম ৩টি এবং গলদা চিংড়ির প্রথম ২টি বড় বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রূপান্তিরিত হয় এবং গলদা চিংড়ির বহিঃকঙ্কালের ২য় উদর খন্ডকের প্লিউরার মত বাগদা চিংড়ির ২য় উদর খন্ডকের প্লিউরা ১ম ও ৩য় উদর খন্ডকের প্লিউরাকে আবৃত করে না। তাছাড়া গলদা চিংড়ির তুলনায় বাগদা চিংড়ির শিরোবক্ষ অঞ্চল তুলনামূলকভাবে উদর অঞ্চলের চেয়ে ছোট।

চিংড়ির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি শনাক্ত করা হয়।

চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস

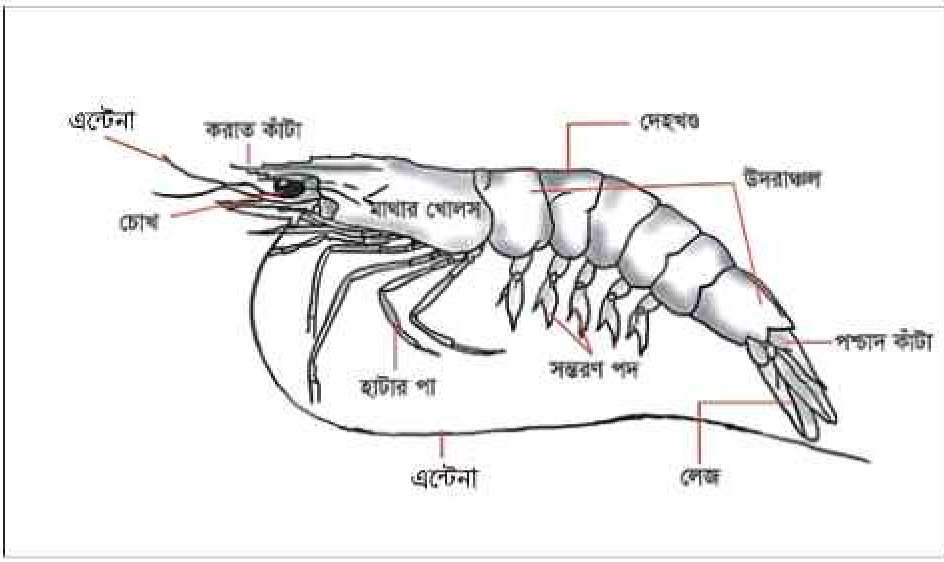
সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণীকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে কতকগুলো স্তরে সাজানোর এক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাসের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি শনাক্তকরণ, প্রজাতি বিন্যস্তকরণ ও অন্যান্য প্রাণীর সাথে জাতিগত সম্পর্ক নিরুপণ করা যায়। চিংড়ি প্রজাতিগুলোকে সাধারণত দু'ভাবে ভাগ করা যায়, যথা- পিনাইড (penaeid) ও পিনাইড বহির্ভুত (non-penaeid)। এই দুই দলভুক্ত চিংড়িকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। পিনাইড বহির্ভূত চিংড়ির বহিঃকঙ্কাল-এর ২য় প্লিউরা ১ম ও ৩য় প্লিউরাকে আংশিক ঢেকে রাখে। কিন্তু পিনাইড দলভুক্ত চিংড়িতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তাছাড়া পিনাইড চিংড়ির ১ম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ এবং পিনাইড বহির্ভূত চিংড়ির ১ম দুইটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রুপান্তরিত হয়। পিনাইড পুরুষ চিংড়িতে জননাঙ্গ পেটাসমা এবং স্ত্রী চিংড়িতে জননাঙ্গ থেলিকাম বিদ্যমান থাকে। পিনাইড বহির্ভুত স্ত্রী চিংড়িগুলো গুচ্ছাকার ডিমগুলো প্লিওপডদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বহন করে থাকে কিন্তু স্ত্রী পিনাইড চিংড়ি ডিম সরাসরি পানিতে ছাড়ে।

চিংড়ি আর্থ্রোপোডা পর্বের ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণির ডেকাপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এই বর্গের কিছু চিংড়ি মিঠাপানিতে এবং কিছু চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ চিংড়িকে সাধারণ পিনাইডি, পেলিমনিডি, প্যানডেলিডি, হিপোলিটিডি, এলফিডি ও সারগেষ্টিডি এই ৬টি গোত্রে ভাগ করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাগদা ও গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস হলো:

পর্ব (Phylum)	: আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)
শ্রেণি (Class)	: ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea)
বর্গ (Order)	: ১. পিনাইডি (Penaeidae)
	২. পেলিমনিডি (Palaemonidae)
গণ (Genus)	: ১. পিনিয়াস (*Penaeus*)
	২. ম্যাক্রোব্রাকিয়াম (*Macrobrachium*)
প্রজাতি (Species)	: ১. বাগদা (*Penaeus monodon*)
	২. গলদা (*Macrobrachium rosenbergii*)

বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়, লম্বাকৃতি, প্রতিসম ও খন্ডিত। দেহ মস্তক ও উদরে বিভক্ত। চিংড়ির মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করা হয় না বলে মাথা ও বুককে একসঙ্গে বলা হয় শিরোবক্ষ বা সেফালোথোরাক্স (cephalothorax)। উদর (abdomen) ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে শুরু হয়ে লেজ (telson) এর সাথে



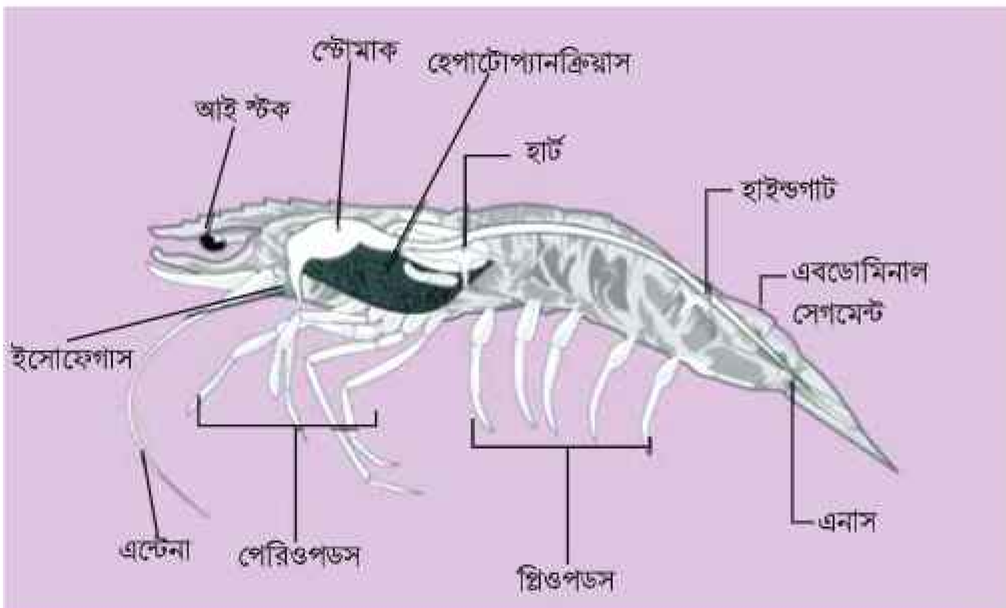
চিত্র- ১.১৩: বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ

মিশেছে। শিরোবক্ষে ১৩টি ও উদরে ৬টি উপাঙ্গ আছে। চিংড়ির দেহ কাইটিন নামক খোলস দিয়ে আবৃত, যা ক্যালসিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত। মস্তকের সম্মুখভাগে করাতের ন্যায় কাইটিন আবরণকে রোস্ট্রাম (rostrum) বলে।

চিংড়ির খোলস দেহের প্রতিটি অংশকে ঘিরে রাখে এবং একটি খোলস অপর খোলসের সাথে সন্ধিল পর্দা (arthrodial membrane) দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। যার ফলে খোসাগুলো সহজে নড়াচড়া এবং প্রয়োজনে লম্বা হয়ে যেতে পারে। বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ হলো- ১. রোস্ট্রাম, ২. রাস্ট্রোল কাটা, ৩. পোষ্ট অর্বিটাল কাটা, ৪. হেপাটিক কাটা, ৫. কেরাপাস, ৬. প্রথম উদর উপাঙ্গ, ৭. ষষ্ঠ উদর উপাঙ্গ, ৮. টেলসন, ৯. ইউরোপড, ১০. প্লিওপড, ১১. পঞ্চম পেরিওপড, ১২. প্রথম পেরিওপড , ১৩. এন্টেনা, ১৪. এ্যান্টেনাল কাঁটা ১৫. এন্টেনাল ব্লেড ও ১৬.এ্যান্টেনাল ফ্লাজেলা ।

বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ গঠন ও অঙ্গাসমূহ

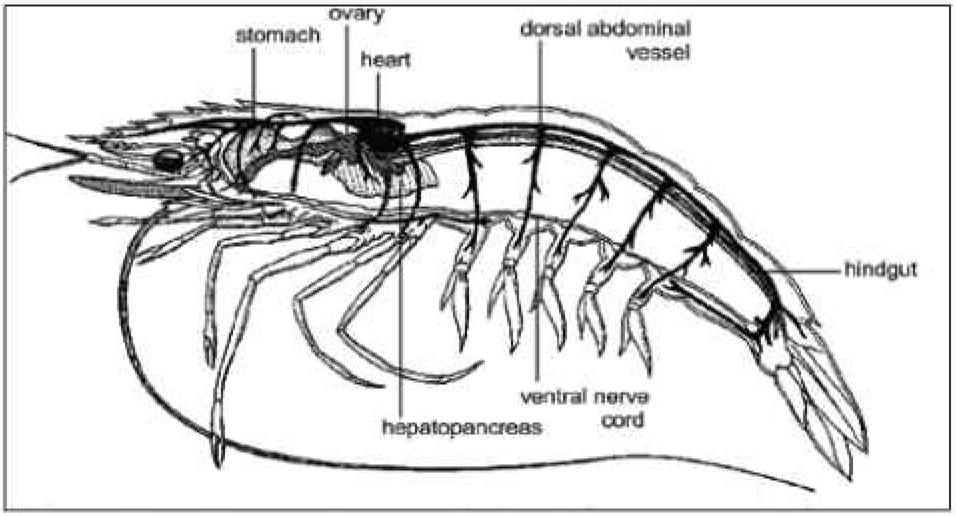
দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গাতন্ত্রের কার্যকারিতার ফলে বাগদা চিংড়ি জীবনধারণ করে থাকে। বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান প্রধানত পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র নিয়ে গঠিত।



চিত্র- ১.১৪: বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ

ক. পরিপাকতন্ত্র

বাগদা চিংড়ি সর্বভুক্ত ও নিশাচর প্রাণী। এরা সাধারণত রাতের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। দিনের বেলায় কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ি চিমটাযুক্ত পা দিয়ে খাদ্যকণা মুখের ভিতরে নিক্ষেপ করে। অতঃপর খাদ্যকণা ম্যাক্সিলিপেডের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুখের অভ্যন্তরের বিভিন্ন উপাঙ্গের সাহায্যে খাদ্যকণা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাতে পরিণত হয়ে খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র মুলত পরিপাকনালি ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি সমন্বয়ে গঠিত। পরিপাকনালি মুখগহবর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। অগ্র পরিপাকনালি ও পশ্চাৎ পরিপাকনালি থেকে সহজেই মধ্য পরিপাকনালিকে আলাদা করা যায়। কারণ অগ্র ও পশ্চাৎ পরিপাকনালিতে কাইটিনের সারি বিদ্যমান কিন্তু মধ্য পরিপাকনালিতে এ ধরনের কোন কাইটিন সারি থাকে না।



চিত্র-১.১৫: বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র

খ. রেচনতন্ত্র

অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানত দু'টি কাজ সম্পাদন হয়ে থাকে। প্রথমত রেচনতন্ত্র বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ বা দুষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করে থাকে এবং দ্বিতীয়ত দেহ অভ্যন্তরস্থ লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া। প্রস্রাবে হিসেবে এই অ্যামোনিয়া ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। এই গ্রন্থিটি ম্যাক্সিলার গোড়ায় অবস্থিত। বাগদা চিংড়ির এই অঙ্গটি তেমন একটা উন্নত নয় এবং কিছু কিছু অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেনঘটিত দুষিত পদার্থ ফুলকার সাহায্যে নির্গত হয়। বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে না। ক্রাস্টেসিয়ার অন্তর্গত অধিকাংশ প্রাণী যে

বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন করে থাকে তার ঘনত্ব ও রক্তের ঘনত্ব একই থাকে। তথাপি এই গ্রন্থি পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম সংরক্ষণে সম্পৃক্ত থাকে এবং অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম সালফেট নির্গমনে সহায়তা করে। সাধারণত চিংড়ির ক্ষেত্রে লবণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ফুলকাই এর প্রধান অঙ্গ। যে সকল প্রাণীর রক্তের লবণের ঘনত্ব এবং এদের চতুর্পার্শ্বের পানির লবণের ঘনত্ব বিভিন্ন রকম তাদেরকে অসমোরেগুলেটর বলা হয় এবং যাদের ঘনত্ব একই রকম তাদেরকে অসমোকনফরমারস বলে।

গ. শ্বসনতন্ত্র

চিংড়ির শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ফুলকা। এই ফুলকার সাহায্যে চিংড়ি অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। পেরিওপডের কক্সা থেকে থলের ন্যায় এই ফুলকার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ এপিপোডাইটের উন্নত অবস্থাই ফুলকা হিসেবে পরিচিত। বক্ষের উভয় পার্শ্বের ব্রাঙ্কিওল প্রকোষ্ঠের সাথে ফুলকা সংযুক্ত থাকে। ব্রাঙ্কিওল প্রকোষ্ঠে পানি প্রবাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ আছে কিন্তু মূলত স্ক্যাফোগন্যাথাইটের সাহায্যে এই কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। ম্যাক্সিলার এক্সোপোডকেই স্ক্যাফোগনাইট বলা হয়। এই স্ক্যাফোগনাইট পানিকে প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত করে থাকে। চিংড়ির রক্তের শ্বাস রঞ্জককে হেমোসায়ানিন বলে। চিংড়ির রক্ত সাদা বা বর্ণহীন হয়ে থাকে। তবে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দেখতে কিছুটা নীলাভ।

ঘ. স্নায়ুতন্ত্র

চিংড়ির স্নায়ুতন্ত্র যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন স্নায়ু অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সাথে সেরিব্রাল গ্যাংলিয়ন সংযুক্ত থাকে। চক্ষু স্ট্যাটোসিস্টস, প্রোপ্রাওরিসিপ্টরস, ট্যাক্টাইল রিসিপ্টর এবং কেমোরিসিপ্টরস চিংড়ির স্নায়ু অঙ্গ হিসেবে কাজ করে থাকে। চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে সুপ্রা-ইসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়ন বা মস্তিস্ক বলে। অগ্রবর্তী মস্তক উপাঙ্গের গোড়ার পশ্চাৎ দিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবস্থিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা- ১. অগ্রবর্তী প্রোটোসেরিব্রাম, ২. মধ্য ডিউটোসেরিব্রাম এবং ৩. পশ্চাৎবর্তী ট্রাইটোসেরিব্রাম।

ঙ. রক্ত সংবহনতন্ত্র

চিংড়ির হৃৎপিন্ড দেখতে অনেকটা সাধারণ নালির মত। হৃৎপিন্ডটি চিংড়ির বুকের পৃষ্ঠদেশীয় অঞ্চল বরাবর পরিপাকনালির উপরে এবং পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের সাথে সংযুক্ত থাকে। চিংড়ির রক্ত সংবহণ প্রণালির প্রধান অঙ্গ অগ্রবর্তী এওর্টা হৃৎপিন্ড থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। চিংড়িতে কোনো শিরা থাকে না। অনেকগুলো সাইনাসের মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। ধমনি ও সাইনাসের ভাল্ব রক্তকে পিছনের দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। চিংড়ির রক্তে দু'ধরনের কোষ থাকে, যথা- ছোট হাইয়ালিন এবং বড় দানাদার

এ্যামিবোযাইটিস। মস্তক বক্ষ অঞ্চলের স্ট্রায়েটেড পেশী এবং অঙ্কীয় স্নায়ু কর্ডের মধ্যবর্তী অংশে সাইনাস অবস্থিত। প্রতিটি দেহ খন্ডকের সাথে প্রত্যেকটি গ্যাংলিয়নকে সংযুক্ত দেখা যায়।

চ. প্রজননতন্ত্র

সাধারণত একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি, স্ত্রী চিংড়ি অপেক্ষা আকারে ছোট হয়। বাগদা চিংড়ি সাধারণভাবে ১০ থেকে ১২ মাসের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে। এ সময় প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়।



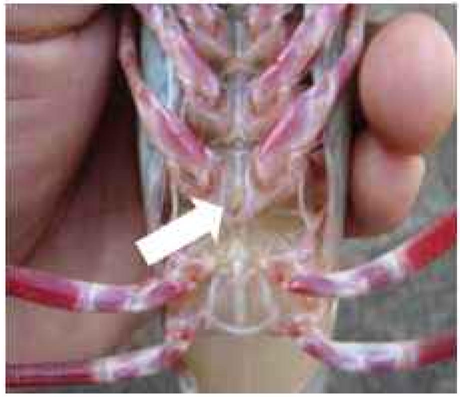
চিত্র-১.১৬: সমবয়সী পুরুষ চিংড়ি (উপর) ও স্ত্রী চিংড়ি (নিচ)

পুংপ্রজননতন্ত্র

পুরুষ চিংড়ির প্রথম জোড়া সন্তরণ পদে একজোড়া পেটাসমা এবং পঞ্চম জোড়া চলন পদের গোড়ায় এক জোড়া পুং জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র থাকে। চিংড়ির দ্বিতীয় পর্যায়ের বা গৌণ যৌনাঙ্গ সঙ্গমে সহায়তা করে। দ্বিতীয় সন্তরণ পদে এপেনডিক্স ম্যাসকুলিনা থাকে। পেটাসমা ও এপেনডিক্স ম্যাসকুলিনা স্পার্মাটোফোর বা বীর্য স্থানান্তরে সহায়তা করে থাকে। চিংড়ির পুং জননতন্ত্র এক জোড়া টেসটিস, ভাস ডিফারেন্সিয়া এবং এক জোড়া প্রান্তিক বীর্য থলি দ্বারা গঠিত। বীর্য থলে পুং জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র পথে বের হয়ে আসে। পেটাসমা স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামে বীর্য স্থানান্তরের কাজ করে থাকে।



চিত্র-১.১৭: পুরুষ চিংড়ির জননরন্ধ্র
(৫ম জোড়া চলনপদের গোড়া)



চিত্র-১.১৮: স্ত্রী চিংড়ির জননরন্ধ্র
(৩য় জোড়া চলনপদের গোড়া)



চিত্র-১.১৯: স্ত্রী বাগদা চিংড়ির সন্তরণ পদের গোড়ায় কোন পেটাসমা নাই



চিত্র-১.২০: পুরুষ বাগদা চিংড়ির ১ম জোড়া সন্তরণ পদের গোড়ায় ১ জোড়া পেটাসমা

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

স্ত্রী চিংড়ির জননেন্দ্রিয় একজোড়া ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালি দ্বারা গঠিত। পরিপক্ক চিংড়ির ডিম্বাশয় লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ডিম্বনালি তৃতীয় জোড়া চলন পদের গোড়ায় উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী চিংড়ির ৪র্থ ও ৫ম জোড়া চলন পদের মধ্যবর্তী স্থানে থেলিকাম ও ৩য় জোড়া চলন পদের গোড়ায় এক জোড়া স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র থাকে। স্ত্রী চিংড়ি সঙ্গমকালে পুরুষ চিংড়ির বীর্য নির্গত হলে থেলিকামের মধ্যে ধারণ করে রাখে এবং ডিম ছাড়ার সময় পানিতে এ বীর্য ছেড়ে দেয়। স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামের রন্ধ্র বা ছিদ্র সাধারণ অবস্থায় বন্ধ থাকে। তবে খোলস

২০১৫

বদলানোর পর খোসা শক্ত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত এ ছিদ্র খোলা থাকে। তাই স্ত্রী চিংড়ি খোলস বদলানোর পর পরই পুরুষ চিংড়ির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। পুরুষ চিংড়ি বদ্ধ জলাশয়ে পরিপক্কতা লাভ করে কিন্তু স্ত্রী চিংড়ি বদ্ধ জলাশয়ে পরিপক্কতা লাভ করে না।

স্ত্রী চিংড়ির চোখের বোটায় এক্স অঙ্গ ও সাইনাস গ্রন্থি থাকে। এক্স অঙ্গ ডিম্বাশয় পরিপক্কতা লাভ রোধের হরমোন উৎপাদন করে এবং সাইনাস গ্রন্থি তা মজুদ রাখে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই হরমোন উৎপাদিত হলেও পরিবেশগত কারণেই উৎপাদিত হরমোনের পরিমাণ কমে যায় এবং স্ত্রী চিংড়ি পরিপক্কতা লাভ করে। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদিত হরমোন চিংড়ি শরীরেই থেকে যায়, ফলে ডিম্বাশয় পরিপক্কতা লাভ করে না। তাই হ্যাচারিতে স্ত্রী চিংড়ির ডান অথবা বাম চোখের বোটা কেটে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে উক্ত চোখের বোটার কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিলে হরমোন উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। এবং ডিম্বোশয় পরিপক্কতা লাভ করে। স্ত্রী চিংড়ির চোখের বোটার কার্যক্ষমতা নষ্ট করার পদ্ধতিকে Eyestalk Ablation (ESA) বলে।

১.৪ বাগদা চিংড়ির জীবন বৃত্তান্ত

গভীর সমুদ্র থেকে উপকুলীয় অঞ্চলের আধা বা ঈষৎ লবণাক্ত জলাশয় পর্যন্ত বাগদা চিংড়ির জীবনচক্র বিস্তৃত। বাগদা চিংড়ির জীবনের কিছু পর্যায় গভীর সমুদ্রে এবং কিছু পর্যায় মোহনা অঞ্চলের নদীসমুহে সমাপ্ত হয়। বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো: ডিম (egg), ভ্রুণ (embryo), লার্ভা (larvae) (নপ্লিয়াস লার্ভা, জুইয়া লার্ভা ও মাইসিস লার্ভা), পোস্ট লার্ভা বা পিএল (post larvae- PL), জুভেনাইল বা কিশোর চিংড়ি ((juvenile) এবং পুর্ণাঙ্গ চিংড়ি (adult)।



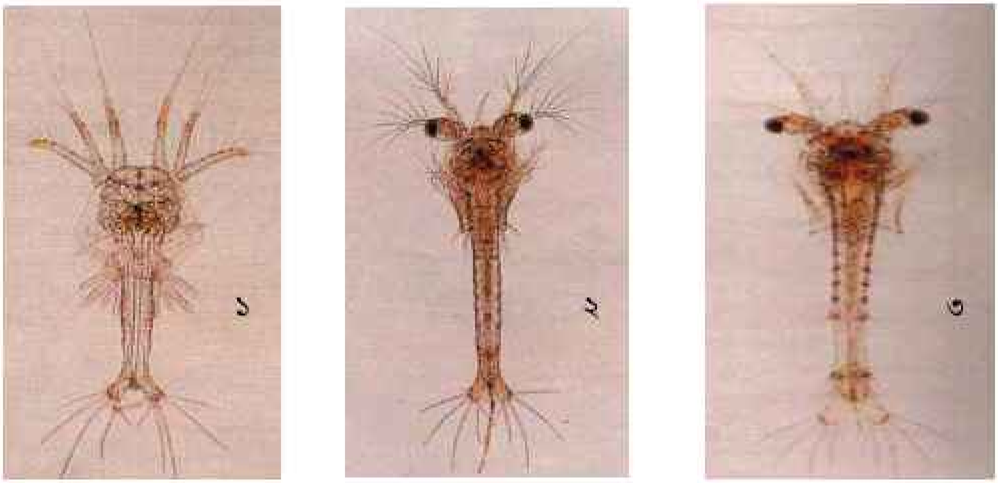
চিত্র-১.২১: বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

ক. ডিম

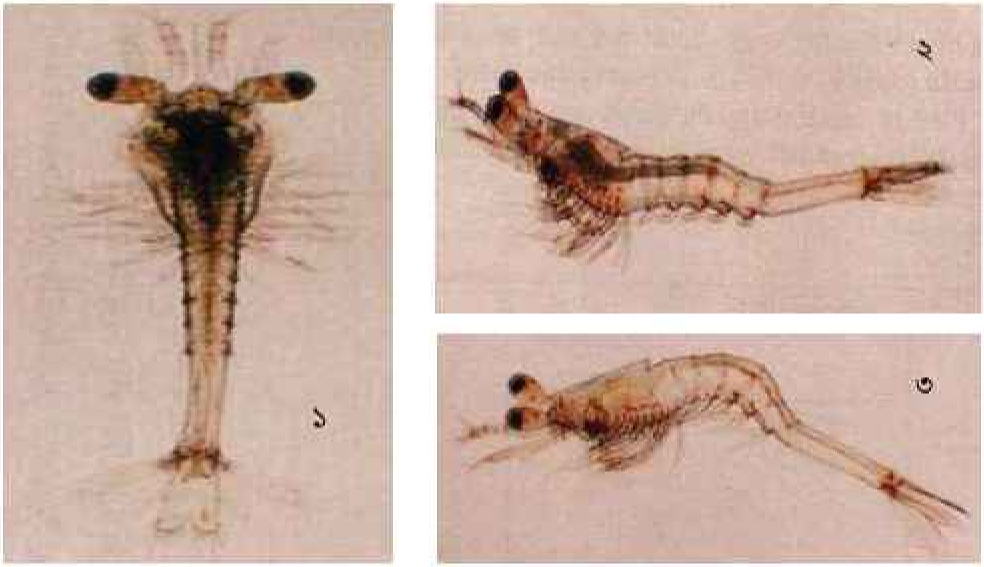
প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার উদ্দেশ্যে পূর্ণ বয়স্ক বাগদা চিংড়ি অভিগমন করে গভীর সমুদ্রের পরিপূর্ণ লবণাক্ত পানিতে (ন্যুনপক্ষে ৩০ পিপিটি) চলে আসে এবং এখানে ডিম ছাড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশে স্ত্রী বাগদা চিংড়ি সাগরের ১৮ থেকে ৩৬ মিটার গভীরতায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলো আকারে খুব ছোট এবং এদের বর্ণ সবুজ হলুদাভ বা স্বচ্ছ বর্ণের হয়ে থাকে। ডিম পাড়ার সময়েই শুক্রকীট দ্বারা ডিমগুলো নিষিক্ত হয় এবং এই নিষিক্তকরণ চিংড়ির দেহের বাইরে ঘটে থাকে। ডিম ফোটার ঠিক আগে পরিণত নপ্লিয়াসকে ডিমের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। ডিমের ভ্রূণ বিভাজন শুরু হয়। প্রথমে ২ কোষ, পরে ৪ কোষ, মরুলা এবং শেষে নপ্লিয়াস ধাপে পৌঁছায়। ডিম ছাড়ার আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিমের মধ্যে ভ্রূণ দেখা যায়। ২ কোষ, ৪ কোষ, মরুলা এবং শেষে নপ্লিয়াস ধাপে আসতে সময় লাগে যথাক্রমে ০.৫, ১.০, ১.৮ ও ১১.০ ঘন্টা। একটি স্ত্রী-চিংড়ি একবারে ২ থেকে ৮ লক্ষ (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ১ থেকে ১২ লক্ষ) পর্যন্ত ডিম ছাড়তে পারে। নিষিক্ত ডিম সমুদ্রের পানি অপেক্ষা সামান্য ভারী বিধায় পানিতে ডুবে যায়।

খ. লার্ভা

লার্ভা অবস্থার প্রথম দশাকে নপ্লিয়াস বলে। এই নপ্লিয়াস দশার ৬টি অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৩৬ থেকে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে। নপ্লিয়াসের পরের দশাকে প্রটোজুইয়া বলে। এই দশার অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৫ দিন সময় লাগে। প্রটোজুইয়ার পরের দশাকে মাইসিস বলে। এই দশার ৩টি অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৪ থেকে ৫ দিন সময় লাগে। মাইসিস-এর পরবর্তী দশাকে মেগালোপা বলে। মেগালোপা পর্যায়ে দেহ স্বচ্ছ বর্ণের হয়ে থাকে এবং শুঙ্গের গোড়া থেকে টেলসনের প্রান্ত পর্যন্ত একটি পাড় বাদামী লম্বা টানা রেখার মত দাগ থাকে।



চিত্র-১.২২: জুইয়ার বিভিন্ন দশা (১, ২ ও ৩)



চিত্র-১.২৩: মাইসিস-এর বিভিন্ন দশা (১, ২ ও ৩)

গ. পোস্ট লার্ভা (পিএল)

এই ধাপের প্রথম পর্যায়ে দেহ স্বচ্ছ বর্ণের হয়ে থাকে এবং অঙ্কীয় দেশে মেগালোপা ধাপের মত গাঢ় বাদামী দাগ থাকে। এই পর্যায়ের ধাপকে প্রাথমিক পর্যায়ে পোস্ট লার্ভা (পিএল) বলে এবং শেষ পর্যায়ের ধাপকে আঙ্গুলীপোনা বলা হয় । উদর খন্ড শিরোবক্ষ খন্ডের চেয়ে ছোট হয়। এই সময় দেহ, রোস্ট্রামের দাঁত ও ফুলকার আবির্ভাব ঘটে। শিরোবক্ষের খোলস ২.৭ মিমি লম্বা হলে এদের দেহ কালো বর্ণ ধারণ করে এবং খোলস ২.২-২১.০ মিমি লম্বা হলে রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৭টি এবং নিচে ৩টি দাঁত থাকে। এই পর্যায়ে চিংড়ি হামাগুড়ি ও সাঁতার দিতে শুরু করে।



চিত্র-১.২৪: বাগদা চিংড়ির পোস্ট লার্ভা (পিএল)

২০২৫

ঘ. জুভেনাইল বা কিশোর চিংড়ি

এই পর্যায়ে চিংড়ির দেহের আকৃতি প্রায় পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো কিংবা কিছুটা বড় হয়। শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ১১ মিমি হলে এদের জননেন্দ্রিয় শনাক্ত করা যায়। কিশোর চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ১১ থেকে ৩৪ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুরুষ চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩০ মিমি হলে এরা পুরুষ জননাঙ্গ যুক্ত পেটাসমা ধারণ করে এবং স্ত্রী চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩৭ মিমি হলে স্ত্রী জননাঙ্গে থেলিকাম দেখা যায়।



চিত্র-১.২৫: জুভেনাইল বা কিশোর চিংড়ি

ঙ. তরুণ চিংড়ি

চিংড়ি এই পর্যায়ে পরিপক্কতা লাভ করে। শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩০ মিমি হলে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে এবং এই পর্যায়ে স্ত্রী চিংড়ির আকার পুরুষ চিংড়ির চেয়ে বড় হয়ে থাকে। এই সময় তরুণ চিংড়ি মোহনা থেকে গভীর সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পুরুষ চিংড়ি ও স্ত্রী চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৭ মিমি ও ৪৭ মিমি এ পৌঁছালে এরা প্রথম যৌন মিলনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এই মিলনক্রিয়া সাধারণত সমুদ্রে যাওয়ার পূর্বে মোহনা অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

চ. পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি

এই পর্যায়ে চিংড়ি যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। স্ত্রী চিংড়ি ডিম ছাড়ার জন্য সমুদ্রে চলে যায়। সমুদ্রের ১৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এদের বিচরণক্ষেত্র। পরিপক্ক পুরুষ চিংড়ি পঞ্চম চলন পদের গোড়ায় পুংজনন ছিদ্রে শুক্রকীটের মোড়ক (spermatophores) দেখা যায়। পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বকোষের উন্নতি বাইরে থেকে দেখা যায়। স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়ের আকার ও রং এবং ডিম্বাণুর মাপের ওপর নির্ভর করে ডিম্বাশয়ের পূর্ণতা।

২০২৫





চিত্র-১.২৬: পূর্ণাঙ্গ বাগদা চিংড়ি

পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়কে ৫টি দশায় ভাগ করা যায়, যথা-

প্রথম দশা (immature stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয় খুব পাতলা ও স্বচ্ছ এবং পিঠের খোলসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। এই সময় ডিম্বাণু খুব ছোট থাকে এবং ফলিকল সেল (follicle cell) এর স্তরে ঢাকা থাকে।

দ্বিতীয় দশা (early developing stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয়ের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ডিম্বাশয় ঢলঢলে এবং সাদা থেকে ফিকে জলপাই রঙের একটি লম্বা ফিতার মতো পৃষ্ঠদেশে খোলসের নিচে দেখা যায়।

তৃতীয় দশা (nearly ripe stage): বর্ধিত ও হালকা নীল বর্ণের ডিম্বাশয় সহজেই দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ভাগে ডিম্বাশয়ের দুই পার্শ্ব একটু বেড়ে কিছুটা ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

চতুর্থ দশা (ripe stage): গাঢ় সবুজ জলপাই রঙের পরিপক্ক ডিম্বাশয় পরিষ্কার দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ডিম্বাশয় পরিপূর্ণ ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

পঞ্চম দশা (spent stage): এই অবস্থায় ডিম ছাড়ার পর ডিম্বাশয় প্রায় প্রথম দশার মতো দেখায়। তবে আংশিক ডিম ছাড়লে দ্বিতীয় দশার মতো দেখায়। একটি পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ি বছরে প্রায় ৩.০ থেকে ৭.৭৫ লক্ষ ডিম ধারণ করে থাকে। বাগদা চিংড়ির প্রজনন গভীর সমুদ্রে ঘটে থাকে। এদের প্রজনন ক্রিয়া সাধারণত রাতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির মিলন কাল ৩ থেকে ৪ মিনিট স্থায়ী হয়। প্রথমে পুরুষ চিংড়ির উপর সমান্তরালভাবে স্ত্রী চিংড়ি অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি একে

অপরকে অঙ্গীয় দেশে আকড়িয়ে ধরে এবং পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির দেহের নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। অবশেষে পুরুষ চিংড়ি দেহের উদরের অংশ বাঁকিয়ে স্ত্রী দেহের মাঝখানে U আকৃতির বেষ্টনি তৈরি করে।

বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি: বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পর্যায়	শুরু হয়	সময়কাল	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য (মিমি) পুরুষ	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য (মিমি) স্ত্রী	খাদ্যাভাস	আবাসস্থল
ডিম (ভ্রুণ)	নিষিক্তকরণ	১২ ঘন্টা	-	০.২৯	/	সাগরের তলদেশ
লার্ভা	ডিম থেকে ফোটা	২০ দিন	-	০.৫-২.২	প্লাঙ্কটনিক	সাগরের তলদেশ
জুভেনাইল	ফুলকা অঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা	১৫ দিন	-	২.২-১১	বেনথিক	মোহনা
কিশোর চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি	৪ মাস	১১.৩	১১-৩৭	বেনথিক	মোহনা
তরুণ চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা এবং প্রথম সঙ্গম	৪ মাস	৩০.৩৭	৩৭-৪৮	বেনথিক	অভ্যন্তরীণ ও বাইরের লিটোরাল এলাকা
পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি	দেহের সব অঙ্গের উপস্থিতি ও পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি	১০ মাস	৩৭.৭১	৪৭-৮১	বেনথিক	বাইরের লিটোরাল এলাকা

সারণি: বাগদা চিংড়ির জীবদ্দশায় বিভিন্ন ধাপের খাদ্যভ্যাস

ক্রমিক	ধাপ	খাদ্য
০১	ডিম থেকে নপ্লিয়াস পর্যন্ত ৬টি ধাপ	দেহে সঞ্চিত কুসুম থলি থেকে খাদ্য যোগায়।
০২	জুইয়া	ডায়াটম জাতীয় উদ্ভিদ কণা, স্কেলেটোনমা, নিটসিয়া, কিটোসেরাস ইত্যাদি খাদ্য।
০৩	মাইসিস	রটিফার, কপিপড, আর্টিমিয়া ও উদ্ভিদ কণা জাতীয় খাদ্য।

০৪	পোস্ট লার্ভা	রটিফার, কপিপড, আর্টিমিয়া ও উদ্ভিদ কণা জাতীয় খাদ্য।
০৫	পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি	ছত্রাক ও শৈবাল, গলিত জৈব পদার্থ, ছোট ছোট কুচো চিংড়ি, মশার লার্ভা, শামুকের ডিম, ক্রাস্টেসিয়ানস ইত্যাদি খাদ্য।

সারণি: পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ির মধ্যে শনাক্তকরণ বৈশিষ্টসমূহ

ক্রমিক	**পুরুষ বাগদা**	**স্ত্রী বাগদা**
০১	পুরুষ বাগদায় পেটাসমা নামক জননেন্দ্রিয় বিদ্যামান।	স্ত্রী বাগদায় থেলিকাম নামক জননেন্দ্রিয় বিদ্যমান।
০২	প্রথম জোড়া সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে পেটাসমা অবস্থিত।	চতুর্থ ও পঞ্চম জোড়া সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে থেলিকাম অবস্থিত।
০৩	পুরুষ বাগদার শেষ দুই জোড়া চলন পদ বড় এবং ডেকটাইলাম সুচালো।	স্ত্রী বাগদার শেষ দুই জোড়া চলন পদ ছোট এবং ডেকটাইলাম সুচালো নয়।

২০২৫

অনুসন্ধানমূলক কাজ

বাগদা চিংড়ি চাষ এলাকার যেকোন একটি বাগদা চিংড়ির খামার পরিদর্শন করো। খামার ভালোভাবে পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছক পুরণ

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
পরিদর্শনকৃত চিংড়ি খামারের নাম	
জলাশয়ের মালিকানা	
খামারের অবস্থান বা ঠিকানা	
জলাশয়ের ভৌত অবস্থা	১. ২. ৩.
চাষকৃত প্রজাতির নাম	১. ২. ৩.
খামারে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	
খামারে কর্মরত কর্মীগণ কর্তৃক কাজের সময় ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলোর নাম	১. ২. ৩. ৪. ৫.
পরিদর্শনকৃত খামারটির সার্বিক উন্নয়নে ৫টি পরামর্শ প্রদান কর।	১. ২. ৩. ৪.

নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

বাংলাদেশের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহের নাম ও আয়তন লিখ।

ক্রমিক.	জলাশয়ের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ	জলাশয়ের নাম	আয়তন (হেক্টর)
১.	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়		
২.	অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়		
	মোট		

জব ১: বাগদা ও গলদা চিংড়ি শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতি ও উপযুক্ত আকারের চিংড়ি সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	প্লাস্টিকের বালতি	১৫ লিটার	১টি
০৩	পাতিল	১০ লিটার	১টি
০৪	স্কুপনেট	ছোট মাপের	১টি
০৫	ট্রে	ছোট মাপের	১টি
০৬	চিমটা	মাঝারি মাপের	১টি
০৭	আঁতশ কাঁচ	৫ সেমি	১টি
০৮	মিটার স্কেল	০.৫ মিটার	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বিভিন্ন চিংড়ি	প্রমান সাইজের	প্রতি প্রজাতির ৫টি
০২	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার/খামার থেকে প্রতিটির ৪-৫টি করে তাজা বা সদ্য আহরিত চিংড়ি সংগ্রহ করো।
২. পাতিল বা ব্যাগে যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে চিংড়ি পরিবহণ নিশ্চিত করো।
৩. আহরিত চিংড়ি যথাযথ স্থান বা রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করো।
৪. চিংড়ি চিহ্নিতকরণের জন্য নির্ভরযোগ্য ক্যাটালগ ব্যবহার করো।
৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো।
৬. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

কাজের সতর্কতা

- চিংড়ি পরিবহণের সময় সংরক্ষণ পাত্রের তাপমাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না থাকলে চিংড়ির গুণগতমান ঠিক থাকে না।
- নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স বই/ক্যাটালগ না পাওয়া গেলে চিহ্নিতকরণ সঠিক হবে না।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ি শনাক্তকরণ কৌশল অনুশীলন করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

২০২৫

জব ২: বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত আকারের চিংড়ি সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	প্লাস্টিকের বালতি	১৫ লিটার	১টি
০৩	পাতিল	১০ লিটার	১টি
০৪	স্কুপনেট	ছোট মাপের	১টি
০৫	ট্রে	ছোট মাপের	১টি
০৬	চিমটা	মাঝারি মাপের	১টি
০৭	আতশ কাঁচ	৫ সেমি	১টি
০৮	মিটার স্কেল	০.৫ মিটার	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বাগদা চিংড়ি	প্রমান সাইজের	৮- ১০টি
০২	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার/খামার থেকে ৮-১০টি করে তাজা বা সদ্য আহরিত বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. পাতিল বা ব্যাগে যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেচিংড়ি পরিবহণ নিশ্চিত করো।

৩. বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ আঁতশ কাঁচ ও নিডল ব্যবহার করে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

৪. ব্যবহারিক খাতায় চিংড়ির ছবি এঁকে বাহ্যিক অঙ্গসমূহ চিহ্নিত করো।

৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন করো।

৬. অনুশীলনের পর চিংড়িগুলোকে স্পেসিমেন জারে সংরক্ষণ করো।

কাজের সতর্কতা

- সতেজ ও বড় আকারের বাগদা চিংড়ি না হলে বাহ্যিক অঙ্গসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
- মানসম্পন্ন ডিসেক্টিং বক্স না থাকলে বাহ্যিক অঙ্গসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না ।

আত্মপ্রতিফলন

বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ শনাক্ত করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী উপযুক্ত আকারের চিংড়ি সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট , মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	প্লাস্টিকের বালতি	১৫ লিটার	১টি
০৩	পাতিল	১০ লিটার	১টি
০৪	স্কুপনেট	ছোট মাপের	১টি
০৫	ট্রে	ছোট মাপের	১টি
০৬	চিমটা	মাঝারি মাপের	১টি
০৭	আঁতশ কাঁচ	৫ সেমি	১টি
০৮	মিটার স্কেল	০.৫ মিটার	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বাগদা চিংড়ি	প্রমান সাইজের	৮- ১০টি
০২	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার/খামার থেকে ৮-১০টি করে তাজা বা সদ্য আহরিত বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করো।
২. পাতিল বা ব্যাগে যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে চিংড়ি পরিবহণ নিশ্চিত করো।
৩. অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ আঁতশ কাঁচ, ফরসেপ ও নিডল ব্যবহার করে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো।
৪. ব্যবহারিক খাতায় চিংড়ির ছবি এঁকে বাহ্যিক অঙ্গসমূহ চিহ্নিত করো।
৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন করো।
৬. অনুশীলনের পর অবশিষ্ট চিংড়িগুলোকে স্পেসিমেন জারে সংরক্ষণ করো।

কাজের সতর্কতা

- সতেজ ও বড় আকারের বাগদা চিংড়ি না হলে অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
- মানসম্পন্ন ডিসেক্টিং বক্স না থাকলে অঙ্গসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না ।
- নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স বই/ক্যাটালগ না পাওয়া গেলে চিহ্নিতকরণ সঠিক হবে না।

আত্মপ্রতিফলন

বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ শনাক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী ১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন কত?
২. বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় কয়টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়?
৩. বাংলাদেশে বর্তমানে মোট আহরিত চিংড়ির পরিমাণ কত?
৪. চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্ঠদেশের আবরণ কি নামে পরিচিত?
৫. বাগদা চিংড়ির দেহে সর্বমোট কয় জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে?
৬. চিংড়ির রক্তের রং কী?
৭. বাগদা চিংড়ির ডিম ফোটাতে মোট কত সময় লাগে?
৮. বাগদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ৫ টি চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
২. বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের নাম লিখ।
৩. পরিপক্ক চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটনের বিভিন্ন ধাপের নাম লিখ।
৪. বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লিখ।
৫. বাগদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
২. বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ উন্নয়নে বিরাজমান সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো বর্ণনা করো।
৩. বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা করো।
৪. গলদা ও বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির খামার ব্যবস্থাপনা

Farm Management of Bagda Shrimp



বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সুন্দরবন এলাকায় সনাতন পদ্ধতিতে ১৮২৯ সাল থেকে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। কাজেই প্রায় দু'শত বছর ধরে বৃহত্তর খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ধান চাষের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিকভাবে লবণপানির বাগদা চিংড়ি ও মিঠাপানির গলদা চিংড়ি ভেড়ি চাষ পদ্ধতিতে চাষ করা হতো। এ ভেড়ি চাষ পদ্ধতিতে উপকূলীয় এলাকার লবণের মাঠ, ধানক্ষেত বা খালি জায়গায় মাছ চাষের জন্য জোয়ারের পানি প্রবেশ করানো হতো। এ পানিতে মাছের পোনার সাথে চিংড়ির পোনাও প্রবেশ করত এবং মাছসহ চিংড়ির এ পোনাকে ৩ থেকে ৪ মাস খামারে আটকিয়ে রেখে বড় হলে মাছের সাথে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে চিংড়ি আহরণ করা হতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে। সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার এলাকায় বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমানে উল্লিখিত ৪টি জেলার বিভিন্ন এলাকায় আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির খামার গড়ে উঠছে এবং প্রতিনিয়ত বাগদা চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাগদা চিংড়ির খামারের স্থান নির্বাচন করতে পারব।
- খামারের পানির উৎস শনাক্ত করতে পারব।
- খামারের পানির গুণাগুণ পরিমাপ করতে পারব।
- খামারের মাটির গুণাগুণ পরিমাপ করতে পারব।
- চিংড়ি চাষের পুকুর তৈরি করতে পারব।
- খামারের বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণ করতে পারব।
- খামারের পাড় সংস্কার করতে পারব।
- খামারে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ শনাক্ত এবং দূরীকরণ করার পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারব।
- পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির ভালো ও খারাপ পোনা শনাক্ত এবং গণনা করতে পারব।
- পোনা গণনা ও প্যাকিং করতে পারব।
- পোনা অভ্যস্থকরণ ও অবমুক্ত করতে পারব।
- সম্পুরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ করতে পারব।
- নমুনায়নের মাধ্যমে চিংড়ির বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে পারব।
- চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে পারব।

২। বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাগদা চিংড়ি এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি চাষ হয়ে থাকে। কোথাও চাষ হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে, আবার কোথাও হচ্ছে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে এবং কোথাও কোথাও আধানিবিড় পদ্ধতিতে। বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষযোগ্য জলাশয়ের আয়তন প্রায় ১.৯০ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিভিন্ন প্রজাতি বিশেষ করে বাগদা চিংড়ির প্রাকৃতিক আবাসস্থল হিসেবে সমধিক পরিচিত। এই উপকূলীয় এলাকায় মৌসুম ও স্থানভেদে বিভিন্ন মাত্রায় (পিপিটি) লবণাক্ত পানি পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চল বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০২২-২৩ সালে উৎপাদিত মোট চিংড়ির পরিমাণ প্রায় ৭৪ হাজার মেট্রিক টন। এসব উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করা হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষকৃত চিংড়ির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বাগদা চিংড়ি। তাছাড়া বাগদা চিংড়ির সাথে হরিণা, চাকা ও হন্নি চিংড়িসহ মিঠাপানির গলদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। ঘেরে চিংড়ির সাথে

ভেটকি, টেংরা, পারসে, পোয়া, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া ধানের সাথে চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছও চাষ হয়ে থাকে।

চিংড়ি চাষের পরিবেশ এবং ব্যবহৃত প্রযুক্তি বিবেচনায় বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি মূলত ৪ (চার) ধরনের হয়ে থাকে, যথা:

১. সনাতন পদ্ধতি,
২. উন্নত সনাতন পদ্ধতি,
৩. আধা নিবিড় পদ্ধতি এবং
৪. নিবিড় পদ্ধতি।

২.১ বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা

বাগদা চিংড়ি একটি স্পর্শকাতর চাষযোগ্য প্রজাতি হওয়ায় চাষ কার্যক্রমটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। সমগ্র চাষ কার্যক্রমটিকে কয়েকটি ধাপে সম্পাদন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। খামার ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

২.১.১ উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষে ঘেরের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে জোয়ার-ভাটার সময় পানির সরাসরি সংযোগ থাকে। মাটির ধরন হবে দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ। ঘেরে যোগাযোগের জন্য রাস্তা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের সময় নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

ক. দূষণমুক্ত এলাকা: কলকারখানা ও ট্যানারি হতে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন ছাড়া সরাসরি নিক্ষেপের ফলে পানির দূষণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চিংড়ির মড়ক দেখা যায়। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে চিংড়ির জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। সুতারাং এ সমস্ত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই ভালো। বরং দূষণমুক্ত এলাকা চিংড়ি খামারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

খ. অতি বৃষ্টিজনিত বন্যামুক্ত এলাকা: অতি বৃষ্টিজনিত ঢলের পানি খামারের পানির গুণাগুণ, যেমন- লবণাক্ততা, অক্সিজেন, পিএইচ ইত্যাদির হঠাৎ পরিবর্তন করে দেয়, ফলে চিংড়ি চাষ ব্যাহত হয়। এ সমস্ত স্থানে বাঁধ নির্মাণ ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া বৃষ্টি ধৌত খোলা পানিতে জৈব ও অজৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক

বেশি থাকে যা চিংড়ির ফুলকা পচনসহ অনেক রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই অতি বৃষ্টিজনিত এলাকা পরিহার করে বন্যামুক্ত এলাকা চিংড়ি খামারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

গ. পানির উৎস: বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানির প্রয়োজন। এছাড়া চিংড়ি চাষের জন্য অন্যান্য যে সব ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা সমুদ্রের পানিতে বিদ্যমান। তাই খামারের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে চিংড়ি চাষের উপযোগী লবণাক্ত পানি পাওয়া যায়। তাছাড়া চিংড়ি চাষের জন্য যে সব উৎস বা আধার থেকে পানি সরবরাহ করা হবে তা অবশ্যই দূষণমুক্ত হতে হবে। তাছাড়া চিংড়ি খামার থেকে পানির উৎসের দূরত্বের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। দুরুত্ব বেশি হলে সার্বক্ষণিকভাবে পানি পাবার বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সরবারাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

ঘ. জোয়ার-ভাটার বৈশিষ্ট্য: খামারের পানি পরিবর্তন, পানি নিষ্কাশন ও বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য খামার নির্মাণের স্থানে ভূমির উচ্চতার সাথে জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ জানা দরকার। যেসব স্থানে জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ ২-৩ মিটার, সেসব জায়গা খামার স্থাপনের জন্য অধিক উপযোগী। জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধি ৪ মিটারের বেশি বা ১ মিটারের কম হলে বাঁধ নির্মাণ ও পানি সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, ফলে চিংড়ি চাষ লাভজনক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঙ. মাটির গুণাগুণ: মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও ভেদ্যতা, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি চিংড়ি চাষ পুকুরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মাটির গুণাগুণ ভালো না হলে খামার স্থাপন ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়। মাটি যত ভেদ্য হবে পানি চোয়ানোর হার তত বেশি হবে। খামার স্থাপনে মাটির যে গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

১) অভেদ্য মাটি দেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে, তা না হলে খামারে পানি ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

২) মাটির পিএইচ ৫.০ থেকে ৬.৫ থাকতে হয়।

৩) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ২.৫ থেকে ৪.৩% থাকতে হয়।

৪) মাটির ধরন হবে দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ।

৫) অধিক অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অনুপযোগী।

৬) দূষিত গ্যাসমুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

৭) অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত আগাছামুক্ত হতে হবে।

চ. পানির গুণাগুণ: পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, পানির স্বচ্ছতা, পিএইচ, অ্যালকালিনিটি, হার্ডনেস, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় না থাকলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

২০২৫

কাজেই চিংড়ি চাষের জন্য পানির নিম্নোক্ত গুণাগুণসমূহ পার্শ্বে উল্লিখিত মাত্রায় থাকা অপরিহার্য বলে বিভিন্ন গবেষণা তথ্যে পাওয়া যায়।

১. পানির লবণাক্ততা	= ১০.২৫ পিপিটি
২. পানির গভীরতা	= ৬০ সেমি এর উর্ধ্বে
৩. পানির রং	= সবুজাভ বা হালকা হলুদাভ-সবুজ
৪. পানির স্বচ্ছতা	= ২৫-৩৫ সেমি
৫. তাপমাত্রা	= ২৫-৩০ ডিগ্রি সে.
৬. দ্রবীভূত অক্সিজেন	= ৫ পিপিএম এর উপরে
৭. পিএইচ	= ৭.৫-৮.৫
৮. অ্যালকালিনিটি	= ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
৯. মোট হার্ডনেস	= ৪০-১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
১০. হাইড্রোজেন সালফাইড	= ০.০৩ পিপিএম এর কম
১১. আন-আয়োনাইজড অ্যামোনিয়া	= ০.১ পিপিএম এর কম
১২. নাইট্রাইট	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৩. তামা	= ০.১ পিপিএম এর কম
১৪. লোহা	= ০.০১ পিপিএম এর কম
১৫. দস্তা	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৬. পারদ	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৭. জিংক	= ০.২৫ পিপিএম
১৮. ক্যাডমিয়াম	= ০.১৫ পিপিএম

ছ. ভূ-প্রকৃতি: যেখানে খামার স্থাপন করা হবে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি অবশ্যই জানা থাকতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থানও জানা দরকার। লালচে ও এসিড সালফেটযুক্ত মাটি চাষের জন্য অনুপোযোগী । স্থানটি খামার স্থাপনের উপযোগি কি না শুরুতেই যাচাই করে নিতে হবে বিশেষ করে মাটির গঠন।

জ. অবকাঠামোগত সুবিধা: চিংড়ি খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও স্থানান্তরের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না হলে চিংড়ি বিক্রির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সর্বোপরি বন্যামুক্ত এলাকা চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী। এজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আছে এবং পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইসগেট আছে এমন এলাকা নির্বাচন করা উচিত।

ঝ. বিদ্যুৎ সরবরাহ: চিংড়ি খামারে বিদ্যুৎ থাকা জরুরি। খামারের স্থান নির্বাচনের সময় বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক। বিদ্যুৎ না থাকলে ডিজেল চালিত পাম্পে জ্বালানি খরচ বেশি লাগবে। পানি ২০১৫

অপসারণ বা খামারে পানি প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী বিধায় বিদ্যুতের নিশ্চয়তা আবশ্যক।

ঞ. দক্ষ জনশক্তি: চিংড়ি খামার লাভজনক করতে হলে দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই। খামারে সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অধিক উৎপাদনের জন্য খামারের দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাই দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ততা বিবেচনা করে চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত।

ট. উৎপাদন সামগ্রীর প্রাপ্যতা ও সরবরাহ: এমন জায়গায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত যেখানে খুব কাছাকাছি হাট বাজার আছে, যার ফলে খুব সহজেই খামার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সার, চুন, যন্ত্রপাতি ও মেরামত সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া দূরবর্তী বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ঠ. বিরোধমুক্ত এলাকা: বিরোধপূর্ণ এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত নয়। এতে সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া চিংড়ি একটি মূল্যবান ফসল হওয়ায় খামারের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করাসহ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২.১.২ খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

চিংড়ি চাষের সফলতা মূলত সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, স্থান, দক্ষতা, পুঁজি, অবকাঠামোগত সুবিধা, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে আধুনিক চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনাতে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে সঠিকভাবে অবকাঠামো নির্মাণ ও এর যথাযথ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। খামারের সঠিক নকশা প্রণয়নপূর্বক খামারে নিম্নোক্ত অবকাঠামোসমূহ নির্মিত হওয়া আবশ্যক।

ক. বেষ্টনী বাঁধ: উন্নত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষে ঘেরের বাঁধ বা পাড় নির্মাণ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ খেয়াল রাখতে হবে।

১) ঘেরের বাঁধ দৃঢ় এবং মজবুত হতে হবে, যাতে করে পানি ঘের থেকে বেরিয়ে না যায় এবং বাইরে থেকে পানি ঢুকতে না পারে।

২) বাঁধের উচ্চতা হবে ৮ ফুটের অধিক এবং তলা হবে ১২-১৬ ফুট, উভয় দিকের ঢালের (মাটির ধরন অনুযায়ী) অনুপাত হবে ১ ঃ ২ হতে ১ ঃ ১.৫।

৩) ঘেরের পাড়ের চূড়া অন্তত ২ ফুট প্রশস্ত হবে, পাড়ের উভয় ঢালে ঘাস লাগানো যেতে পারে।

খ. পুকুরের বাঁধ বা অভ্যন্তরীণ বাঁধ: খামারের অভ্যন্তরীণ বাঁধ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন চাষ এলাকায় ১-২ মিটার পানি ধরে রাখা যায় অর্থাৎ বাঁধের উচ্চতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার হতে হবে। তবে স্তরে স্তরে মাটি কমপ্যাক্ট করে বাঁধ খুব মজবুতভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে চাষ এলাকা বা পুকুরের পানি বের হয়ে না যায় এবং বাইরের পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুরের পাড় যাতে ধসে না যায় বা অতিবৃষ্টির ফলে বাঁধের মাটি ধুয়ে ক্ষয় হয়ে না যায় সে জন্য বাঁধের গায়ে দুর্বা জাতীয় ঘাস অথবা পুকুরে ছায়া সৃষ্টি করবে না এ রকম গাছ লাগাতে হবে। একটি বাঁধ নির্মাণ করার সময় বিভিন্ন স্থানের পরিমাপ নিচের চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো:

চিত্রে ৬ ফুট গভীরতা সম্পন্ন একটি নার্সারি পুকুর, যার ঢাল জমির বাইরের দিক হতে বকচর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, যেখানে ২ ফুট পর হতে মাটি ফেলা হয়েছে। বাইরের ঢাল ৬ ফুট, বাঁধের উপরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট, বাইরের বাঁধের ভিতরের ঢাল ৬ ফুট ও বকচর ২ ফুটসহ মোট ২০ ফুট। ঘেরের ভেতরের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট যার মধ্যে ২ ফুট বকচর ভেতরের দিকে ঢাল ৪ ফুট, ভিতরের বাঁধের উপরের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও ভেতরের বাঁধের বাইরের ঢাল ৪ ফুট। বাঁধের উচ্চতা নির্ভর করে উক্ত স্থানের বন্যার পানির উচ্চতা, মাটির গঠন ও পুকুরের ব্যবস্থাপনা সুবিধার উপর।

গ. নার্সারি পুকুর: চিংড়ি পোনার সুষম বৃদ্ধি ও পোনার মৃত্যুহার ন্যুনতম পর্যায়ে রাখার জন্য নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। নার্সারি পুকুর যথাযথভাবে তৈরি করতে হবে। এর ফলে পোনার মজুদকালীন মৃত্যুহারও কমে যাবে এবং পোনা দ্রুত বাড়বে। এ ক্ষেত্রে পালনীয় কাজগুলো হলো:

১) নার্সারিতে যাতে ৩ থেকে ৪ ফুট পানি থাকে সে অনুপাতে পুকুর খনন করতে হবে।

২) ঘন মশারির নেট দিয়ে নার্সারি নির্মাণ করতে হবে।

৩) নার্সারির নেট পানির উপরে এক হাত পরিমাণ বাড়তি রাখতে হবে এবং তার মাটিতে কাদার পরিমাণ ৫-৬ ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না।

৪) পুকুরের পাড় অবশ্যই উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে।

৫) ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য বাড়ির কাছাকাছি হওয়া ভালো।

৬) পুকুরে প্রচুর সূর্যের আলো ও বাতাস থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে নার্সারি পুকুরে কমপক্ষে দিনে ৬-৮ ঘন্টা সূর্যের আলো পড়ে।



চিত্র-২.১: একটি আদর্শ নার্সারি পুকুর

ঘ. পালন পুকুর

উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে পালন পুকুর নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যথাযথভাবে পালন পুকুরটি নির্মাণ করা হলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যাবে। পালন পুকুর তৈরিতে নিম্নের যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়-

১) পালন পুকুরের সব জায়গায় ৩ ফুটের অধিক পানি থাকতে হবে।

২) পালন পুকুরের পাড়ে গাছ-গাছালি ও ঝোপ-ঝাড় থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৩) পুরাতন পুকুরের ক্ষেত্রে তলা ভালভাবে শুকাতে হবে প্রয়োজনে কালো মাটি থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪) পালন পুকুরের তলদেশ সমান হতে হবে।

৫) দোআঁশ মাটি হলে পুকুরের ঢাল ১ ঃ ১.৫ এবং বেলে মাটি হলে পুকুরের ঢাল ১ ঃ ২.০ হবে।

৬) এই পদ্ধতিতে একটি আদর্শ পালন পুকুরের আয়তন হওয়া উচিত অনধিক এক হেক্টর।

৭) দিনে কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা পর্যাপ্ত সূর্যালোকে থাকতে হবে।

৮) পুকুরের পাড় অবশ্যই উঁচু ও মজবুত হতে হবে।

২০২৫



চিত্র-২.২: একটি আদর্শ পালন পুকুর

ঙ. রিজার্ভার নির্মাণ: জরুরি প্রয়োজনে পরিশোধিত পানি সরবরাহের জন্য মূল/পালন পুকুরের পাশে একটি ৫-৬ ফুট গভীর রিজার্ভার নির্মাণ করতে হবে। রিজার্ভারের আয়তন পালন পুকুরের চার ভাগের এক ভাগ হতে পারে। সর্বোপরি রিজার্ভারের চারপাশে জালের বেড়া থাকতে হবে।

চ. স্লুইস গেট নির্মাণ: বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। স্লুইস গেটের মাধ্যমে পুকুরে পানি সরবরাহ ও পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিমিত আকারের স্লুইস গেট নির্মাণ করতে হবে। চাষ এলাকায় ঘেরে পানির নিশ্চয়তার জন্য প্রতিটি জোয়ারে ৩০ শতাংশ পানি যাতে সরবরাহ করা যায় এমনভাবে গেট নির্মাণ করতে হবে।



চিত্র-২.৩: চিংড়ি ঘেরে স্লুইস গেট

পানি সরবরাহ গেট পুকুরের তলা থেকে কিছুটা উপরে এবং নিষ্কাশন গেট পুকুরের তলা থেকে কিছুটা নিচুতে স্থাপন করা দরকার। এতে পুকুরে সঠিকভাবে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা যায়। স্লুইস গেট কাঠের, আরসিসি পাইপ বা পিভিসি পাইপ অথবা সিমেন্ট দ্বারা নির্মাণ করা যায়। স্লুইস গেট সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা- প্রধান স্লুইস গেট ও গৌণ বা অপ্রধান স্লুইস গেট। বেষ্টনী বাঁধের উৎসের নিকট যে গেট নির্মাণ করা হয় তাকে প্রধান স্লুইস গেট এবং পুকুরের পাড়ে যে গেট নির্মাণ করা হয় তাকে গৌণ স্লুইস গেট বলে। পানি সরবরাহ খালে পানি সরবরাহ করার জন্য সাধারণত প্রধান স্লুইস গেট ব্যবহার করা হয় এবং সরবরাহ খাল থেকে পুকুরে পানি সরবরাহ করার জন্য গৌণ স্লুইস গেট ব্যবহার করা হয়। একটি কাঠের স্লুইস গেট নির্মাণের সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে-

১) স্লুইস গেটে বা গেটসমূহের আকার বা সংখ্যা এমন হতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ে খামারে পানি প্রবেশ করানো যায় বা সময়মত খামার থেকে পানি বের করা যায়।

২) খামারের এমন স্থানে গেট নির্মাণ করতে হবে যাতে খামারের সমস্ত পানি বের করা সম্ভব হয়। গেটে ছোট ছিদ্রযুক্ত জাল, আহরণ জাল ও ফল বোর্ড বসানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩) গেট পানি নিরোধক হতে হবে যাতে গেটের পার্শ্বে বা তলা দিয়ে পানি প্রবেশ করতে বা পানি বের হয়ে যেতে না পারে।

৪) গেটের তলদেশ দিয়ে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫) গেটের উপরিভাগ দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬) গেটের ডিজাইন এমন হতে হবে যেন সহজে পরিচালনা করা যায়।

পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের কাজ ৪-৬ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। নিষ্কাশন কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য পুকুরের তলদেশ পানি সরবরাহ করানোর গেটের দিক থেকে পানি নিষ্কাশন গেটের দিকে ঢালু হতে হবে। পানি সরবরাহ স্লুইস গেটের মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জাল স্থাপন করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত জলজ প্রাণীর খামারে প্রবেশ বন্ধ করা যায়। আর নিষ্কাশন স্লুইস গেটের মুখে জাল স্থাপন করে অতি সহজেই চিংড়ি আহরণ করা যায়।

ছ. গার্ড শেড, বাসস্থান ও ভান্ডার নির্মাণ: গার্ড শেড, বাসস্থান ও ভান্ডার খামার অবকাঠামোর অন্যতম উপাদান। খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন- চুন, সার, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার জন্য উপযুক্ত ভান্ডার থাকা দরকার। খামারের ভান্ডারটি শুষ্ক স্থানে হওয়া উচিত। এছাড়া খামারের শ্রমিকসহ খামার পরিচালনায় নিয়োজিত অন্যান্য জনবলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান থাকা একান্ত অপরিহার্য। কর্মরত জনবলের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া খামারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গার্ড শেড নির্মাণ করতে হবে।

২.১.৩ বাগদা চিংড়ির খামার/ঘের প্রস্তুতকরণ

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খামার/ঘের/পুকুরের ভৌত অবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সুষ্ঠু পুকুর প্রস্তুতির মাধ্যমে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এছাড়াও চিংড়ি সহজেই পুকুরের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। চিংড়ি চাষ পুকুর প্রস্তুতিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক) পুকুরের তলদেশে জৈব্য বর্জ্য পদার্থ মুক্ত হওয়ার কারণে অক্সিজেন গ্রহণকারী বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

খ) পুকুরের তলদেশ জীবাণুমুক্ত হয়।

গ) পুকুরে পানিতে খনিজ পদার্থ সহজে মুক্ত হতে পারে।

ঘ) পুকুরের তলদেশের মাটিতে সহজে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে। ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে অনুজীবের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও জৈব পদার্থ সহজেই পচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঙ) চিংড়ি উৎপাদনে অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর শৈবালের ব্যাপকতা হ্রাস পায়।

চ) চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর মাছের ডিম, কাঁকড়ার লার্ভা ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রাণীর উপস্থিতি বা উপদ্রব হ্রাস পায়।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পুকুর প্রস্তুতির মাধ্যমে চিংড়ির খাদ্য ও পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে যা পরোক্ষভাবে চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

২.১.৪ চিংড়ি চাষে পুকুর প্রস্তুতির ধাপ

চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুকুরের তলদেশের গভীর কাদার স্তর চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। চিংড়ি চাষ পদ্ধতি অধিক সম্পূরক খাদ্য নির্ভর হওয়ার কারণে পুকুরের তলদেশে গভীর কাদার সৃষ্টি হয়। এ কারণে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ফসল আহরণের পরপরই বা পুনরায় চিংড়ির পোনা মজুদের পূর্বেই পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হয়। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অধিক সার, খাদ্যে বর্জ্য পদার্থ ও প্লাংকটন উৎপাদন সমৃদ্ধ পুকুর ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে ভাল নয়। কেননা এ ধরনের পুকুরের তলদেশে বর্জ্য পদার্থ অধঃক্ষেপনের মাধ্যমে অবায়বীয় গভীর পাঁকের সৃষ্টি হয়। অধিক অবায়বীয় জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ পুকুর চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনে প্রতিকুল প্রভাব ফেলে। কখনও কখনও এ ধরনের অধঃক্ষেপনকৃত পদার্থের কারণে চিংড়ি ও অন্যান্য জীবভরের মৃত্যু ও বিলুপ্তি হতে পারে বা রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এ কারণেই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রথমেই পুকুরের মাটির প্রকৃতি, পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনে পরিবেশগত বাধাসমূহ নির্ণয় করে পুকুর প্রস্তুতির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। নিচে পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো-

ক. পুকুরের পানি বের করে ফেলা: চিংড়ি ও মাছ আহরণের পর পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়াই উত্তম। এ সময় পুকুরের তলদেশ, ঢাল ও নালার অবস্থা, স্লুইস গেট প্রভৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পুকুর প্রস্তুতির কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, যাতে পুকুরের ভৌত অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। পুকুরের তলদেশের কালো মাটি পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরূপ। চিংড়ি আহরণের পরপরই প্রেসার পাইপের মাধ্যমে তীব্র স্রোতে বা বেগে পানি বার বার প্রবেশ ও বের করার মাধ্যমে কালো মাটি অপসারণ করা যেতে পারে। এ কাজটি পুকুরের পানি বের করে দেয়ার সাথে সাথে করতে হবে। যাতে পুকুরের মাটি সূর্যালোকে শক্ত হয়ে যেতে না পারে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কাজটি করলে বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে পিএল মজুদ করা সম্ভব হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ভাইরাসের সংক্রমনের পূর্বেই ফসল আহরণ করা সম্ভব হবে।



চিত্র-২.৪: চিংড়ি খামারের পানি অপসারণ

খ. পুকুর শুকানো: পুকুরে জলস্রোত দিয়ে বা শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে পুকুরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলার পর ১০-১৫ দিন সূর্যালোকে পুকুর এমনভাবে শুকাতে হয়, যাতে পুকুরের তলদেশের মাটিতে ২৫-৩০ সেমি গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। পুকুরের তলদেশের গভীর অঞ্চল শুকানোর ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশন পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে-

- পুকুরের তলার মাটি এমনভাবে শুকাতে হবে যেন মাটিতে ফাটল ধরে এবং কোথাও ভেজা ভেজা বা জলীয় উপাদান না থাকে।
- শুকানোর পর দৃশ্যমান আবর্জনা দূর করতে হবে, ফলে তলার মাটি পরিষ্কার হবে এবং জীবাণু মারা যাবে।
- মাটি শুকানোর পর অতিরিক্ত কাদা, স্তুপীকৃত জৈব পদার্থ, দুর্গন্ধ যুক্ত কালো মাটি ঘের থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।
- পুকুর/ঘের এর তলা ভালোভাবে সমতল করে নিতে হয় এবং পানি নির্গমণ পথের দিকে কিছুটা ঢালু রাখতে হবে।
- অধিক উৎপাদন পেতে হলে পুকুর/ঘের/খামার ভালোভাবে শুকাতেই হবে।



পুকুর তলা শুকানো



কাদা অপসারণ ও তলদেশ সমতলকরণ

চিত্র-২.৫: চিংড়ি খামারের তলদেশ শুকানো ও সমতলকরণ

তাছাড়া পুকুরের ভিতরের অংশ থেকে মাটি কেটে পুকুরের চারপাশে শক্ত, মজবুত, প্রশস্থ ও দৃঢ়ভাবে পাড় তৈরি করতে হবে। চারপাশের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতার চেয়ে প্রধান বাঁধের উচ্চতা কমপক্ষে ৩ ফুট বেশি করতে হবে।

গ. তলদেশের মাটি চাষ: পুকুরের মাটি শুকানোর পর ১০-১৫ সেমি গভীর তলদেশের মাটি লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে ৩-৫ বার চাষ করতে হয়। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ সমৃদ্ধ স্থানসমূহ অধিক গভীর করে চাষ দেয়ার প্রয়োজন হয়। সাধরণত চাষের গভীরতা পুকুরের তলদেশের চাষের ক্ষেত্রে ট্রাক্টর, দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

ঘ. পাড় মেরামত ও বেড়া দেয়া: ঘের প্রস্তুত করার পূর্বেই পাড় মেরামত করা প্রয়োজন। পাড়ে কোন গর্ত থাকলে তা বন্ধ করে ফেলতে হবে। পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মাটি দিয়ে ভালভাবে মেরামত করে নিতে হবে। সম্ভব হলে পাড়ে ঘাস লাগানো যেতে পারে। পাড়ের গর্ত বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া পুকুরের চারদিকে বেড়া দিতে হবে, যাতে কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙ, কুঁচে, শামুক এবং জীবাণুবাহক অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। এর ফলে খামারের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।



পুকুরের পাড় মেরামত



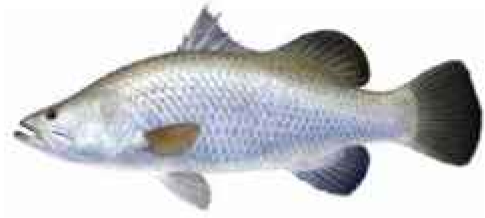
পুকুরের চারপাশে বেড়া দেয়া

চিত্র-২.৬: পুকুরের পাড় মেরামত ও বেড়া দেয়া

২.১.৫ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ

চিংড়ি চাষ একটি অত্যন্ত লাভজনক কার্যক্রম হলেও বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় চিংড়ি চাষে সফলতা নাও আসতে পারে। ব্যর্থতার মাঝে যে সমস্ত কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- পোনা মজুদের পূর্বে সঠিক নিয়মে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর না করা। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ চাষকৃত পুকুরে কী ক্ষতি করতে পারে এ ব্যাপারে অনেকের সুস্পষ্ট ধারনা নেই। নিচে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

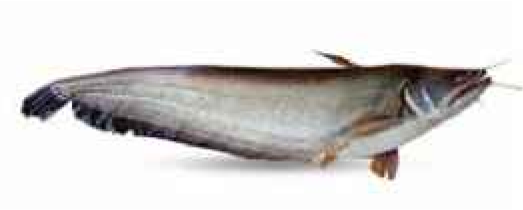
রাক্ষুসে মাছ: যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছ বা চিংড়ি ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে, যেমন- ফলি, বোয়াল, ভেটকি, বেলে, শোল, গজার প্রভৃতি। এরা চাষকৃত চিংড়ি বা চিংড়ির পিএল সরাসরি খেয়ে ফেলে, ফলে চিংড়ির উৎপাদন কমে যায়। নিচে কতিপয় রাক্ষুসে মাছের ছবিসহ নাম উল্লেখ করা হলো :



ভেটকি



শোল



বোয়াল



বেলে



ফলি

চিত্র-২.৭: প্রধান প্রধান রাক্ষুসে মাছ

অবাঞ্ছিত মাছ: যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু চাষকৃত মাছের সাথে অক্সিজেন, খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে তীব্র প্রতিযোগীতা করে তাদের অবাঞ্ছিত মাছ বলে, যেমন- পারসে, তাপসী, চান্দা, তেলাপিয়া, কাকিলা প্রভৃতি অন্যতম। পুকুরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং উৎপাদন অনেক কমে যায়। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য অবাঞ্ছিত মাছের নাম উল্লেখ করা হলো :

২০২৫


তেলাপিয়া


তাপসে


চান্দা


পোয়া


কাকিলা


পারসে

চিত্র-২.৮: প্রধান প্রধান অবাঞ্ছিত মাছ

নিম্নলিখিত কারণে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ চিংড়ি চাষের ঘের/পুকুর থেকে দূর করা প্রয়োজন-

ক) রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত মাছের পোনা খেয়ে ফেলে ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

খ) পুকুরে মজুতকৃত চিংড়ির সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

গ) অবাঞ্ছিত মাছ চাষকৃত চিংড়ির খাদ্যে ভাগ বসায়। তাছাড়া চাষকৃত চিংড়ির সঙ্গে বাসস্থান ও অক্সিজেনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়েও প্রতিযোগিতা করে।

ঘ) উভয় প্রকার মাছই পুকুরে রোগ-জীবাণুর বাহক এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, কারণ বিভিন্ন প্রকার মাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা এক নয়।

ঙ) উভয় প্রকার মাছের উপস্থিতিতেই চিংড়ির উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, উৎপাদন কম হয় এবং লাভের অংশ কমে যায়।

১০২৫

চ) দেখা গেছে ১ কেজি রাক্ষুসে মাছ প্রায় ১০ কেজি চাষকৃত চিংড়ি খেয়ে ফেলে, আবার ১ কেজি রাক্ষুসে মাছ ১০ কেজি চাষযোগ্য মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে।

২.১.৬ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

চিংড়ি চাষ লাভজনকভাবে পরিচালনা করতে হলে চিংড়ি পোনা মজুদের পূর্বে সঠিক নিয়মে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করতে হবে। নিচে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কিভাবে ঘের বা পুকুর হতে দুর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ক) পানি শুকিয়ে: পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুরীকরণের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো স্যালো মেশিন দ্বারা পানি সেচে পুকুর শুকিয়ে ফেলা। পুকুর শুকানোর পূর্বে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে মৌসুমে পুকুর শুকানো হচ্ছে সে মৌসুম পুকুর শুকানোর জন্য উপযোগী কিনা। কারণ পুকুর শুকানোর পরে কমপক্ষে ১৫ দিন রোদে রাখলে তার তলদেশ রোদে ফেটে যাবে, ফলে বিভিন্ন প্রকার বাজে গ্যাস দূর হয়ে যাবে। তলদেশে কাদার মধ্যে সে সমস্ত রাক্ষুসে মাছ লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও অনেকটা কমে যায়। এ কাজটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে করলে খরচও অনেকটা কম হবে।

খ) ঘন ফাঁসের জাল টেনে: পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে এবং পুকুরের তলদেশ সমতল হলে সে সমস্ত পুকুরে যতদূর সম্ভব পানি কমিয়ে দিয়ে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ বহুলাংশে দুর করা যেতে পারে। তবে যত ভালোভাবেই জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দূর করা হোক না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু মাছ থেকে যেতেই পারে। তাই জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন করে যদি পুকুরে পোনা মজুদ করতে হয় তাহলে অবশ্যই বড় সাইজের পোনা মজুদ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে চিংড়ির পোনা মজুদ করা অনুচিত।

গ) জীবন্ত টোপ ব্যবহার করে: অনেক সময় জীবন্ত মাছকে বড়শিতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, গজার, বোয়াল প্রভৃতি মাছ দুর করা হয়। যেহেতু এ জাতীয় মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের তাই ছোট মাছ, যেমন- পুঁটি, খলিসা, টেংরা প্রভৃতি মাছকে বড়শিতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘ) খাবার দেওয়ার পর ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে: এই পদ্ধতিতেও অনেক সময় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করা যেতে পারে। পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছ যখন খাদ্য গ্রহণের জন্য খাদ্য প্রয়োগকৃত অঞ্চলে যাবে তখন ঝাঁকি জালের মাধ্যমে খুব সহজেই ধরা যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই সীমিত এবং এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায় না।

ঙ) মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করে: রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করার ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে এর পরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করে তা দূর করা। ঔষধ

প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিষের ধরন ও বিষক্রিয়ার মেয়াদকালের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ বাজারে এমন কিছু নিষিদ্ধ ও অননুমোদিত বিষ পাওয়া যায় যা ব্যবহারে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ সাশ্রয় মনে হলেও পরিবেশ ও মানব দেহের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। নিচে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের নাম, প্রয়োগ মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেয়া হলো:

১. **রোটেনন:** রোটেনন হচ্ছে ডেরিস নামক গুল্ম জাতীয় এক প্রকার গাছের মূল (শিকড়) থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার জাতীয় পদার্থ যা দেখতে বাদামি বর্ণের। যদিও রোটেনন তরল ও পাউডার এ দুই অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে আমাদের দেশে মুলত পাউডার জাতীয় রোটেনন পাওয়া যায়। রোটেননের শক্তিমাত্রা এর মধ্যে বিদ্যমান মূল কার্যকর উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাজারে দু'ধরনের শক্তি সম্পন্ন রোটেনন পাওয়া যায়, যেমন- ৭% এবং ৯.১% শক্তি সম্পন্ন। তবে ৯.১% শক্তি সম্পন্ন রোটেননই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রোটেনন-এর মাত্রা কম প্রয়োজন হয়। তাই শীতকালে রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমকালের চেয়ে বেশি পরিমাণে রোটেনন প্রয়োজন পড়ে। রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ মাত্রা প্রজাতি, তাপমাত্রা ও শক্তিমাত্রার ওপর নির্ভর করে। রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো:

রোটেননের শক্তি মাত্রা	গ্রাম/শতক/ফুট পানি
৭%	১৬-১৮
৯.১%	১৮-২৫

প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমত রোটেনন পাউডার একটি পাত্রে নিয়ে অল্প অল্প করে পানি যোগ করে পেস্টের মত করে কাই তৈরি করতে হবে। অতঃপর উক্ত কাইকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ গুলে তরল করে এবং এক ভাগ ছোট ছোট বল তৈরি করে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পানি উলট-পালট করে দিলে ভালো হয়। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ ভাসতে শুরু করলে খুব দ্রুত জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। কারণ বেশি দেরি হলে মৃত মাছ পুকুরের তলায় ডুবে যাবে ও মাছ জালে উঠবে না। ভোর বেলায় রোটেনন প্রয়োগ করা ভালো, কারণ তখন পানিতে অক্সিজেন কম থাকে। এর ফলে রোটেনন এর বিষক্রিয়া বেশি কার্যকর হয়।

পুকুরে যখন রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পানি হতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কারণ মাছ যখন পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত নিঃশ্বাস নিতে থাকে, তখন পানিতে দ্রবীভূত রোটেনন এর বিষক্রিয়া দ্বারা মাছের ফুলকার ল্যামেলি আক্রান্ত হয়। ফুলকায় যে গিল ল্যামেলি আছে সেই গিল ল্যামেলিগুলো ফেটে যায়। ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে দেহে পরিবাহিত হতে পারে না। অক্সিজেন পরিবহণের সেই কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পেরে আস্তে আস্তে মারা যায়।

$$O_2 + Hb = HbO_2$$

অক্সিজেন+ হিমোগ্লোবিন = অক্সিহিমোগ্লোবিন

এছাড়াও বিষযুক্ত পানি যখন নিঃশ্বাস এর মাধ্যমে সরাসরি মাছের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন অনুরুপ প্রতিক্রিয়ায় মাছের অভ্যন্তরীণ অংশ, যেমন- পরিপাকতন্ত্র, হৃদযন্ত্র, যকৃত, ফুসফুস প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রক্তনালির দ্রুত ক্ষতিসাধন হয়। ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ও পরিশেষে মাছ মারা যায়।



রোটেনন পাউডার



ফসটক্সিন ট্যাবলেট

চিত্র-২.৯: রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে ব্যবহৃত রোটেনন পাউডার ও ফসটক্সিন ট্যাবলেট

২. ফসটক্সিন/কুইকফস/সেলফস: এগুলো এক ধরনের কীটনাশক। বাজারে ৩ গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট আকারে এগুলো পাওয়া যায়। পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে এগুলো খুবই কার্যকর। তবে মানুষের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত বিধায় সতর্কতার সাথে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য শতকে ১টি ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি: ট্যাবলেটগুলো সমানভাবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেয়ার পর জাল টেনে পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। ট্যাবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা পর মাছ মরে ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ট্যাবলেটের বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল প্রায় ৭ দিন।

৩. ব্লিচিং পাউডার: যদিও এটা পানি বিশোধনে ব্যবহৃত হয়, তবুও এদ্বারা রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। পুকুরে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে আর চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য শতকে ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমত ব্লিচিং পাউডার সুবিধাজনক কোনো পাত্রে পানি দিয়ে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ পাউডার সকালে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০

মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে এর বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল প্রায় ৭ দিন।

৪. চা বীজের খৈল: চা বীজের গুঁড়া হতে এটা তৈরি করা হয়। চা বীজের খৈল প্রথমে বিষ এবং পরে সার হিসেবে কাজ করে। এ পাউডারের মধ্যে স্যাপোনিন নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মাছের রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে ফেলে, ফলে মাছ মারা যায়। পানির তাপমাত্রা বেশি থাকলে এ বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তাপমাত্রা কম হলে এটা ধীরে ধীরে কাজ করে ফলে অনেক সময় ধরে এর কার্যকারিতা থাকে। তাই চা বীজের খৈল তাপমাত্রা বাড়ার আগে সকালের দিকে প্রয়োগ করা ভালো। বিষ প্রয়োগের ৩-৫ ঘন্টার মধ্যেই মাছগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ভাসতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। এটা প্রয়োগে মাছ ছাড়াও চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর ব্যাঙাচি, ছোট শামুক, জোঁক এবং কিছু কিছু পোকামাকড় মারা যায়। তবে চা বীজের খৈল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকারক নয়, যেহেতু চিংড়ির রক্তে লোহিত কণিকা অনুপস্থিত। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য শতকে ১ কেজি চা বীজের খৈল ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমত চা বীজের খৈল প্রথমে অল্প পানিতে গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। এর বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল প্রায় ৩-৪ দিন।



চা বীজের খৈল



মহুয়া বীজের খৈল

চিত্র-২.১০: রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে ব্যবহৃত চা বীজের খৈল ও মহুয়া বীজের খৈল

৫. মহুয়া বীজের খৈল: মহুয়া বীজ হতে তেল নিষ্কাশনের পর যে খৈল অবশিষ্ট থাকে তা বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে স্যাপোনিন (৪-৬%) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে
২০২৫ এই গাছ সামান্য পরিমাণে জন্মে। এটাও চা বীজের খৈলের ন্যায় প্রথমে বিষ ও পরে সার হিসেবে কাজ করে।

এটা প্রয়োগ করার ২ ঘন্টার মধ্যেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং মাছ মরে ভারসাম্যহীনভাবে ভাসতে শুরু করে। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য শতকে ৩ কেজি চা বীজের খৈল ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমত মহুয়া বীজের খৈল প্রথমে অল্প পানিতে গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে থাকে। এর বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল প্রায় ৩-৪ দিন।

ঔষধ প্রয়োগে সতর্কতা

- ঔষধ প্রয়োগের সময় নাকে মুখে কাপড় এবং হাতে পলিথিন বেঁধে নিতে হবে।
- ঔষধ বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- ঔষধ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।
- ঔষধ প্রয়োগের পর পাত্রটি ভালভাবে পরিষ্কার করুন।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

বিষাক্ততা পরীক্ষার সময়: পুকুরে চিংড়ির রেণু/পিএল মজুদ করার ১-২ দিন পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার পদ্ধতি সমূহ হলো:

হাপার সাহায্যে বিষাক্ততা পরীক্ষা: পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার জন্য পুকুরে একটি হাপা টাঙিয়ে তার মধ্যে অল্প পরিমাণে যে কোনো রেণু/চিংড়ির পিএল ছেড়ে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ রেণু/পিএল (৭০% বেঁচে থাকে) মারা না যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নেই। এ অবস্থায় পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা যাবে। যদি এ সময়ের মধ্যে পুকুরে বেশি পরিমাণে রেণু/পিএল মারা যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা আছে।



পুকুরে স্থাপিত হাপা



পানি ভর্তি বালতি

চিত্র-২.১১: পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

বালতিতে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা: যে পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা হবে তার পানি একটি বালতিতে (১০-১৫ লিটার) নিয়ে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দু'টি বালতির একটিতে রেণু ছাড়া পুকুরের এবং অন্যটিকে টিউবওয়েল বা অন্য একটি ভালো পুকুরের ১০-১৫ লিটার পানি দিতে হবে। পুকুর থেকে পানি নেয়ার সময় উপর, মধ্য ও নিচের পানি ভালভাবে মিশ্রিত করে নিতে হবে। বালতি দু'টিতে অল্প কিছু রেণু ছেড়ে ৩-৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দু'টি বালতিতে একই সময়ে সমান সংখ্যক পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে বিষাক্ততা নেই। যদি রেণু ছাড়ার পুকুরের পানিযুক্ত বালতিতে অধিকাংশ পোনা/পিএল বেঁচে থাকে তা হলেও বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নেই। পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা থাকলে কোনো অবস্থাতেই পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত পানির বিষাক্ততা শেষ না হয় ততদিন অপেক্ষা করা উচিত।

২.১.৭ চুন প্রয়োগ ও পিএইচ ব্যবস্থাপনা

চুন হলো ক্যালসিয়ামযুক্ত অজৈব যৌগ যা অম্লত্ব হ্রাস বা প্রশমনে, প্রাণীর দৈহিক কাঠামো গঠন ও রোগজীবাণু ধ্বংস করতে সহায়তা করে। চুনের মধ্যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের ঋনাত্বক আয়ন থাকে, যা পানির অম্লত্বকে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা: পুকুরে চুন প্রয়োগ করলে একসঙ্গে অনেকগুলো উপকার পাওয়া যায়। এর প্রধান প্রধান গুণাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) চুন চিংড়ি চাষের পরিবেশ অর্থাৎ মাটি ও পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বকে নিরপেক্ষ করে। পানির পিএইচ চিংড়ি চাষের অনুকূলে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে

২০২৫

থাকলে সেই পুকুরের চিংড়ির বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়।

খ) চুন প্রয়োগের ফলে পুকুরের মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ তথা খনিজ পদার্থ (যা পানির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক) অতি সহজেই মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে। ফলে পুকুরের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ) চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর, এমন ধরনের রোগ বিস্তারের উৎস, রোগজীবাণু ও রোগজীবাণু পরিবাহক পরজীবীসমূহকে চুন ধ্বংস করে তথা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে।

ঘ) চুন পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত জৈবকণা ও কাদাকে অধঃক্ষেপ না করে পানিকে পরিষ্কার রাখতে তথা দূর করতে সহায়তা করে। পুকুরে পর্যাপ্ত আলোর অনুপ্রবেশ নিশ্চিত হয়, ফলে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

ঙ) চুন পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত দূষিত গ্যাসসমূহ দূর করে।

চ) চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে বিশেষ করে প্রজননকালে ভ্রূণের বর্ধনে ও খোলস গঠনে সহায়তা করে।

ছ) চুন পানিতে প্রয়োগকৃত সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তথা পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন তৈরি করে পানির বর্ণ সবুজ করতে সহায়তা করে।

জ) চুন প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থসমূহ ভেঙে গিয়ে মাটি ও পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

ঝ) প্রয়োজনীয় উপকারী জীবাণুর বংশ বৃদ্ধিতে জৈব পদার্থসমূহের সুষ্ঠু পচনের জন্য চুন সহায়তা করে।

ঞ) সালোকসংশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার মাত্রা কমিয়ে আনে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ট) চুন প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং পুকুরের তলদেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বের করে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুকুরের তলার মাটি নিরপেক্ষ হয়।

ঠ) চুন পুকুরের পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের ক্ষতিকর প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং এদের বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। এর ফলে পুকুরের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

ড) চুন প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়।

ঢ) চুন মাটি ও পানির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডের মত অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থের স্থায়ী বদ্ধ হওয়াকে প্রতিরোধ করে।

ণ) চুন বাফার (কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সংরক্ষণাগার) হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ চুন এর বাফারিং প্রক্রিয়ায় পুকুরের পানির কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সাথে মিশে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট তৈরি করে এবং এই ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট বাফার হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাইকার্বোনেট পুকুরের পিএইচকে স্থির অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে।

চুনের প্রকারভেদ: বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়, যেমন- পাথুরে চুন, পোড়া চুন, কলিচুন ইত্যাদি। এছাড়াও শামুক ও ঝিনুকের খোলস পুড়িয়ে এক ধরনের চুন পাওয়া যায়। তবে এগুলো চিংড়ি চাষের পুকুরে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায় না। নিচের সারণিতে চুনের প্রকারভেদ ও উৎস উল্লেখ করা হলো:

সারণি: চুনের প্রকারভেদ ও উৎস

ক্রমিক	চুনের নাম	উৎস
০১	পাথুরে চুন	খনিতে প্রাপ্ত, বাজারে পাওয়া যায় না
০২	পোড়া চুন	খনিতে প্রাপ্ত, পোড়ানোর পর বাজারে পাওয়া যায়
০৩	কলি চুন	পোড়া চুন আর্দ্রতাযুক্ত হয়ে বা পানিতে গোলানোর পর প্রাপ্ত চুন
০৪	ডলোমাইট	প্রক্রিয়াজাতকৃত যৌগ চুন
০৫	জিপসাম	প্রক্রিয়াজাতকৃত যৌগ চুন

প্রয়োগ মাত্রা: পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুকুরের বয়স, পানির পিএইচ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। কাদা মাটি, এঁটেল মাটি ও লাল মাটির পুকুরে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে একটু বেশি চুন প্রয়োজন হয়। পুকুর দীর্ঘদিন আগাছা ও পচা আবর্জনায় পূর্ণ থাকলে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে চুন বেশি দরকার হয়। সাধারণত শতাংশ প্রতি এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। পোড়া চুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দ্বিগুণ এবং কলিচুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দেড় গুণ। নিচে পিএইচ এর ওপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেয়া হলো:

পিএইচ মান	৩-৫ এর মধ্যে	৫-৬ এর মধ্যে	৬-৭ এর মধ্যে
পোড়া চুনের পরিমাণ	৬ কেজি/শতাংশ	৪ কেজি/শতাংশ	১-২ কেজি/শতাংশ

প্রয়োগ পদ্ধতি: পুকুর তৈরির সময় প্রয়োজনীয় চুন একটি মাটির চাড়ি বা গামলার মধ্যে কমপক্ষে ১২-২৪ ঘন্টা আগে গুলে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় চুন পাড়সহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন ব্যবহারের সময়কাল হলো চাষ দেয়ার ২-৩ দিন পর অথবা বিষ প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর।

২০২৫



শুকনো ঘেরে চুন প্রয়োগ



পানি ভর্তি ঘেরে চুন প্রয়োগ

চিত্র-২.১২: পুকুরে চুন প্রয়োগ

সতর্কতা

- পোড়া চুন এবং কলি চুন অত্যন্ত ক্ষারীয় তাই এটি ব্যবহারে পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়, এজন্য পুকুর শুকানো অবস্থায় তা ব্যবহার করা নিরাপদ।
- চুন ব্যবহারের সময় নাক ও মুখ গামছা দিয়ে বেধে নিতে হবে।
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে।
- চুন গুলানোর সময় তাপ সৃষ্টি হয় সেজন্য প্লাস্টিকের বালতিতে চুন গুলানো যাবে না।
- চুন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- ব্যবহারের পর পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

পিএইচ (pH)

পিএইচ হচ্ছে কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বের ঋণাত্মক লগারিদম। সহজ ভাষায় পিএইচ হচ্ছে কোনো বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায়। পিএইচ ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। পানির পিএইচ যদি ০-৭ এর মধ্যে থাকে তবে তা অম্লীয়। এই অম্লীয় পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে। আবার পিএইচ যদি ৭-১৪ এর মধ্যে থাকে তবে তা ক্ষারীয়। এই ক্ষারীয় পানিতে অক্সাইড আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ পানিতে উপরোক্ত উভয় আয়নের পরিমাণ সমান সমান থাকার ফলে পানির গুণাগুণ নিরপেক্ষ বা প্রশম হয়। অর্থাৎ পিএইচ যদি ৭ থাকে তবে তা দ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয়।

২০২৫

চিংড়ি চাষে পিএইচ-এর প্রভাব: চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে পিএইচ মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত চিংড়ি চাষের জন্য মৃদু ক্ষারীয় পানি অর্থাৎ পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এর মাঝে হলে সবচেয়ে ভালো। পানির পিএইচ ৪ এর নিচে নেমে গেলে অর্থাৎ পানি খুব বেশি অম্লীয় হলে চিংড়ি বাঁচতে পারে না। কারণ তখন পানিতে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার পানি যদি খুব বেশি ক্ষারীয় হয় অর্থাৎ পিএইচ মান ৯.৫ এর বেশি হয় তাহলে চিংড়ি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কারণ এই অবস্থায় পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে না। শুধু তাই নয় এই অবস্থায় পানিতে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই দুটো অবস্থাই চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। পিএইচ মান ১১ এর উপরে গেলে চিংড়ি মারা যায়। চিংড়ি চাষে ভালো ফল পেতে হলে চাষিকে অবশ্যই পুকুরের পানির পিএইচ মান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। পিএইচ মান কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম বেশি হলে সম্ভাব্য কারণসমূহ জেনে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। অম্লীয় ও ক্ষারীয় পানির উৎস ও তার প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

অম্লীয় পানির উৎসসমূহ হলো-

ক) মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে বা জৈব পদার্থ বেশি হলে পানিতে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

খ) উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে অধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির সাথে চুন মাটির অভ্যন্তরে তলিয়ে যায়, ফলে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গ) বিভিন্ন কলকারখানার আবর্জনা পানিতে পতিত হয়ে পানির অম্লত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

চিংড়ি চাষে অম্লীয় পানির প্রভাব-

ক) পিএইচ মান ৫ এর নিচে থাকলে অভিস্রবণের মাধ্যমে চিংড়ির দেহের রক্ত থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নসমূহ বের হয়ে যায়। চিংড়ি পর্যায়ক্রমে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন হারানোর ফলে রক্তের গঠন ঠিক রাখতে না পেরে দুর্বল হয়ে পরিশেষে মারা যায়। পানিতে ক্যালসিয়াম কম থাকলে এ ক্ষতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

খ) শরীর থেকে প্রচুর বিজল বা মিউকাস বের হয় এবং চিংড়ি ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে চিংড়ি মারা যায়।

গ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও অনেক সময় খাবারের রুচি হারিয়ে ফেলে।

ঘ) চিংড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হলে সহজে ঘা সারে না।

ঙ) পানিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি হলে চিংড়ির প্রজনন অঙ্গের বৃদ্ধি অসম পর্যায়ের হয়ে থাকে, যা ডিম পরিস্ফুটন বা পোনা উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে।

চ) পুকুরের পানিতে সহজে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে না।

ছ) পানিতে অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও চিংড়ি তা গ্রহণ করতে পারে না ফলে চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে ও পরিশেষে মারা যায়।

ক্ষারীয় পানির উৎসসমূহ হলো-

ক) ক্যালসিয়াম ও সিলিকা সমৃদ্ধ মাটি।

খ) পুকুরের পানি ঘন সবুজ হলে অত্যাধিক সালোকসংশ্লেষণের জন্য দিনের বেলায় পানির পিএইচ মান সামান্য বেড়ে যায়। ফলে পানি ক্ষারীয় হতে পারে।

চিংড়ি চাষে ক্ষারীয় পানির প্রভাব-

ক) পানির পিএইচ মান ১১ এর বেশি হলে চিংড়ির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

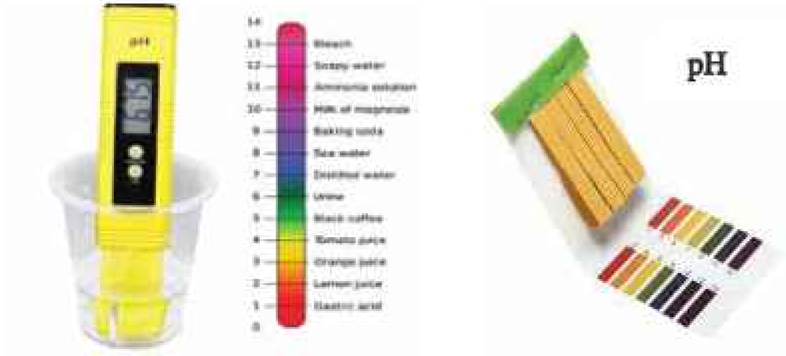
খ) পিএইচ মান বেড়ে গেলে চিংড়ির চোখের লেন্স এবং কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে যায়, পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়, অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে মারা যায়। চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবারে রুচি কমে যায়। অনেক সময় চিংড়ি প্রজনন ক্ষমতাও কমে যায়।

পানির পিএইচ মান পরীক্ষাকরণ: পানি অম্লীয় না ক্ষারীয় তথা পানির পিএইচ মান কত তা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। নিচে কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো –

ক) লিটমাস কাগজ: লিটমাস কাগজ পানিতে ডুবানোর পর কাগজের রং যদি লাল হয়ে যায়, তবে তা অম্লীয় পানি এবং যদি নীল হয়ে যায় বা লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন না হয় তবে তা ক্ষারীয় পানি।

খ) ডিজিটাল পিএইচ মিটার: আধুনিক পদ্ধতিতে ডিজিটাল পিএইচ মিটারের সাহায্যে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পানির পিএইচ এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

২০২৫



চিত্র-২.১৩: পিএইচ মিটার ও পিএইচ পেপার

গ) পিএইচ পেপার: পিএইচ পেপার একটি গোলাকার চাকতির ভিতর পেচানো থাকে। পেচানো অংশ থেকে এক টুকরো (১ ইঞ্চি পরিমাণ) কাগজ নিয়ে ৩০ সেকেন্ড পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর পানি থেকে উঠালে কাগজের রং পরিবর্তিত হবে। রং বদলানো কাগজটিকে চাকতির গায়ে আঁকা বিভিন্ন রংয়ের সাথে মিলিয়ে দেখলেই ঐ পানির পিএইচ বুঝা যাবে অর্থাৎ পানিতে ডুবানোর পর ঐ কাগজের পরিবর্তনকৃত রং চাকতির গায়ে আঁকা যে রঙের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে সেখানে লিপিবদ্ধ পিএইচ মানই হবে ঐ পানির পিএইচ মান।

মাটির পিএইচ পরীক্ষা পদ্ধতি

কোন পুকুরের তলা থেকে এক মুঠ (প্রায় ২০ গ্রাম) মাটি নিয়ে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে গুঁড়া করে পাউডার বানাতে হবে। এই পাউডারের দ্বিগুণ পরিমাণ পরিষ্কার ফোটানো ঠান্ডা পানিতে মিশিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। পরদিন সকালে পিএইচ কাগজ দিয়ে থিতানো পানির পিএইচ পরীক্ষা করতে হবে। প্রাপ্ত পিএইচ হবে পরীক্ষিত পুকুরের মাটির পিএইচ।

পিএইচ কমে গেলে বা পানি অম্লীয় হলে করণীয়

যে কোন কারণে পুকুরের পানির পিএইচ কমে যেতে পারে। যদি কোনো কারণে পিএইচ মান কমে যায় তাহলে অম্লীয় পানিতে শতাংশ প্রতি ১ কেজি পোড়া চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের পরিমাণ অম্লতা বা পানির পিএইচ এর উপর নির্ভরশীল।

পিএইচ বেড়ে গেলে বা পানি ক্ষারীয় হলে করণীয়

অপ্রত্যাশিতভাবে পানির পিএইচ বেড়ে গেলে পিএইচ কমানোর নিমিত্ত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যেমন- প্রাথমিকভাবে তেঁতুল গোলানো পানি বা তেঁতুল/সজনের পাতা ভেজানো পানি দিতে হবে। তবে শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতা

ক্ষারত্ব ও খরতা হলো পানিতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের আয়নের পরিমাপক।

ক্ষারত্ব: সাধারণত ক্ষারত্ব হলো কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট ও হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিমাপক। পুকুরে এর মাত্রা ২০ মিগ্রা/লিটার এর নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

খরতা: সাধারণত খরতা হলো ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরিমাপক। যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। পানির খরতা ২০ মিগ্রা/লিটার এর কম হলে পানির বাফার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং চিংড়ির জন্য তা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভালো জলাশয়ের খরতা ৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার এর মধ্যে হওয়া উচিত।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ক্ষারত্ব ও খরতার প্রভাব: চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভালো। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মিগ্রা/লিটার এর কম ও ৩০০ মিগ্রা/লিটার এর বেশি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়। ফলে পানির পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে। পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না। ক্ষারত্ব ৩০০ মিগ্রা/লিটার এর বেশি হলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (ফাইটোপ্লাংকটন) হ্রাস পায়। কারণ তখন সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে না। চিংড়ি সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

হার্ডনেস: হার্ডনেস-এর দ্বারা পানিতে দ্রবীভূত ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম লবণসমূহের মাত্রা বুঝায়। হার্ডনেস মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.১.৮ পুকুরে সার প্রয়োগ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়ামের দরকার হয়। তাছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কপার, জিংক প্রভৃতি যৌগের দরকার হয়। পুকুরে যে চুন দেয়া হয় তা ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশের পুকুরের মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ব্যতীত বাকি মৌলগুলো চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তাই পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরির জন্য বাইরে থেকে কেবল নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সরবরাহ করলেই চলে।

বাগদা চিংড়ির খামারে কাঁটা শেওলা উৎপাদনের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করা হলে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। খামারে একবারে পানির গভীরতা অধিক বৃদ্ধি করা ঠিক নয়, কারণ সূর্যালোকের অনুপস্থিতির কারণে

শেওলা উৎপাদন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে ১ ফুট পানি প্রবেশ করিয়ে ১০-১৫ দিন কোন কার্যক্রম ছাড়াই ফেলে রাখতে হবে, অতঃপর প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি প্রবেশ করাতে হবে। কাঁটা শেওলার উপর নির্ভর না করে খাদ্য এবং সার প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নততর পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে নিম্নলিখিত হারে রোটেনন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পর পুকুর/খামারে সার প্রয়োগ করতে হবে:

- ইউরিয়া : ২০-২৫ কেজি/হেক্টর (প্রতি শতাংশে ৮০-১০০গ্রাম)
- টিএসপি : ২০-২৫ কেজি/হেক্টর (প্রতি শতাংশে ৮০-১০০ গ্রাম)
- খৈল : ৩০-৪৫ কেজি/হেক্টর (প্রতি শতাংশে ১২০-১৮০ গ্রাম)

সার প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়সমুহ হলো

ক) কী পরিমাণ সার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তির ওপর।

খ) সাধারণত বেলে মাটিতে যেখানে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কম থাকে সেখানে সারের পরিমাণ একটু বেশি দিতে হয়। আবার পলি মাটিতে যেখানে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে সেখানে পরিমাণ একটু কম দিতে হবে।

গ) জৈব সারের ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

ঘ) অজৈব সার শুষ্ক পুকুরে দেয়া যাবে না।

ঙ) অজৈব সার চিংড়ি ছাড়ার ৪/৫ দিন পূর্বে পরিমিত পরিমাণে দিতে হবে।

চ) সার বৃষ্টির দিনে না দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

২.১.৯ পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে খামারে পোনা ছাড়ার পর পরই ব্যাপকভাবে পোনা মারা যায়। সাধারণত পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা হয় এবং দুর-দুরান্ত থেকে এসব পোনা পরিবহণ করে এনে খামারে মজুদ করা হয়। ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ক্লেশ, পোনার ক্লেশ ও খামারের পানিতে খাপ খাওয়ানো বা অভ্যস্তকরণ ঠিকমত না হওয়ার ফলে পোনা মারা যায়। তাই পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনার মুল বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিলে মজুদকালে পোনার মৃত্যুহার যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব। মজুদ ব্যবস্থাপনার মুল বিষয়গুলো হলো-

ক. পোনা শনাক্তকরণ

বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চল, সাগর এলাকা, নদ-নদী ও খাল বিল বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি পোনার উৎসস্থল। চাষের জন্য বিশেষ করে লোনাপানির বাগদা চিংড়ির পোনা এবং মিঠাপানির গলদা চিংড়ির পোনা প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। প্রাকৃতিক উৎস থেকেই মুলত এসব চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে এসব পোনা সংগ্রহের সময় অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির পোনা ধরা পড়ে। বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির পোনা থেকে বাগদা

ও গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্ত করে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ি পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো:

১. বাগদা চিংড়ি: বাগদা চিংড়ির পোষ্ট লাভা বা পিএল অন্যান্য চিংড়ির পোস্ট লার্ভার চেয়ে আকারে বড় হয়। দেহের গঠন সরু ও লম্বাটে হয়ে থাকে। চক্ষু তুলনামুলকভাবে বড়। পিএল এর দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর লেজ পর্যন্ত বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। জুভেনাইল অবস্থায় এই দাগ সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং পেটের দিকে তখন এটি একটি কাঠির মত দেখায়।খড়গ বা শুড় সোজা এবং ডগাটি সামান্য উপর দিকে বাঁকানো থাকে। খড়গের উপর তলে ৫টি দাঁত দেখা যায়। ১ম তিন জোড়া পায়ের শেষ প্রান্তে ছোট চিমটা আছে। ২য় পা ১ম পায়ের চেয়ে সামান্য লম্বা এবং ৩য় পায়ের চাইতে ছোট বা সমান।

২. চাকা চিংড়ি: এই চিংড়ির পোনা বাগদা চিংড়ির পোনার চেয়ে আকারে অনেক ছোট। এদের দেহের রং স্বচ্ছ সাদা এবং রোস্ট্রামের অগ্রভাগ গোলাপী রঙের হয়ে থাকে। পুচ্ছ পাখনা ও টেলসনে অস্পষ্ট লালচে বাদামি দাগ দেখা যায়। চক্ষু দন্ড হালকা হলুদ বর্ণের এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদর খন্ডে মধ্যবর্তী পৃষ্ঠ কাঁটা থাকে। রোষ্ট্রামের উপরিভাগে ১টি মাত্র দাঁত দেখা যায় এবং এই রোস্ট্রাম চক্ষু ছাড়িয়ে সম্মুখের দিকে প্রসারিত। এরা পাত্রের গা ঘেসে দ্রুত সাঁতার কাটে এবং নড়াচড়া অনুভব করলে লাফাতে চেষ্টা করে, সাধারণত এরা সাঁতারের সময়ে ধড়ের মাঝামাঝি সামান্য উঁচু করে সাঁতার কাটে।

৩. বাগতারা চিংড়ি: এই পোনা দেখতে অনেকটা বাগদা চিংড়ির পোনার মত, তবে তুলনামুলকভাবে বাগদা পোনার চেয়ে আকারে ছোট। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৪-৫টি দাঁত আছে। পোনার উদরের তলদেশে ৪-৫টি লালচে বাদামি রঙের ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে। ষষ্ঠ উদর খন্ডকের পিঠের দিকে একটি কাঁটা থাকে। এদের তলপেটে পিছন দিকে ইংরেজি 'এম' অক্ষরের মত নীলাভ কালো দাগ দেখা যায়।

৪. হন্নি চিংড়ি: এরা দেখতে অনেকটা হরিণা চিংড়ির মত এবং দেহের রং অনেকটা বাদামি বা খয়েরি রঙের। শুঙ্গের বৃন্তে লালছে ধরনের রঞ্জন কণা থাকে। এদের রোস্ট্রাম ত্রিকোণাকৃতির এবং এর উপরিভাগে ৪-৭টি দাঁত থাকে। চক্ষু বৃন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। উদর খন্ডকের পাশের নিচের দিকে লাল ইটের মত ডোরা এবং ইউরোপড ও লেজে দাগ থাকে।

৫. কেরাণী চিংড়ি: এদের রোস্ট্রাম ছোট, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ ও ত্রিকোণাকৃতির। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৩-৪টি দাঁত থাকে তবে নিচের দিকে কোনো দাঁত থাকে না। ক্যারাপেসে ২-৩টি এপিগ্যাস্ট্রিক কাঁটা থাকে। ইউরোপডের ডানায় একটি বাদামি ফোঁটা দাগ থাকে। এদের শরীরে এ্যান্টিনাল ও হেপাটিক কাঁটা দেখা যায়। এন্টিনিউলার পেডাংকেলের অগ্রভাগ রঙিন এবং এদের লেজে ছোপ ছোপ দাগ থাকে।

৬. গলদা চিংড়ি: গলদা চিংড়ির পিএল দেখতে স্বচ্ছ এবং পিএল এর মাথার খোলস এর উপর ২-৫টি লম্বালম্বি কাল বর্ণের বন্ধন থাকে। ক্রমান্বয়ে গলদা বড় হতে থাকলে উক্ত বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে পেটের প্রতিটি খন্ডের সংযোগস্থলে বলয় দেখা যায়। পিএল পর্যায়ের বয়স ৩০-৩৫ দিন এবং দৈর্ঘ্য ১-১.৫ সেমি হয়। গলদা চিংড়ির রোস্ট্রাম বাঁকানো এবং উপরে নিচে খাঁজ কাটা থাকে। পাগুলো বেশ লম্বা হয় এবং ১ম ও ২য় জোড়া পা চিমটাযুক্ত।

৭. ছটকা চিংড়ি: এদের শিরোবক্ষ অংশে লম্বালম্বি অস্পষ্ট দাগ থাকে। উদর অঞ্চলের পার্শ্বীয় অংশে ক্ষুদ্র বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত দাগ পরিলক্ষিত হয়। এই দাগগুলো সারিবদ্ধ ও নিয়মিতভাবে বিন্যস্ত। এই চিংড়ির পোনার রোস্ট্রামটির দৈর্ঘ্য অপেক্ষকৃত ছোট।

খ. পোনার উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

দু'টি উৎস থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। উৎস দু'টি হচ্ছে- প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি বা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র।

প্রাকৃতিক উৎস: সাধারণত 'জো' বা 'গোণ' কালীন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাগদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। ডিসেম্বর-এপ্রিল মাসের মধ্যে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার ২য় থেকে ৫ম দিনের জোয়ার-ভাটার সময় পানির উঠা-নামা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই জোয়ার-ভাটায় পানির সর্বোচ্চ উঠা-নামাকে খুলনা অঞ্চলে গোণ এবং কক্সবাজার অঞ্চলে জো বলা হয়। এই জোয়ার আরম্ভ হওয়ার পর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ঘন্টাই পোনা আহরণের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশের কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বাগদার পোনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় সারা বছরই বাগদার পোনা পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মধ্য এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি পোনা ধরা পড়ে। তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে চাষের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধাসমূহ হলো:

১) প্রাকৃতিক উৎসের পোনার সাথে অন্যান্য চিংড়ির পোনা ও রাক্ষুসে মাছের পোনা থাকে।

২) একই বয়সের ও একই আকারের পানা পাওয়া যায় না।

৩) সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা পাওয়া যায় না।

৪) আহরণ ও পরিবহণজনিত পীড়নের ফলে অনেক সময় পোনা মারা যায়।

৫) পোনা শনাক্তকরণ, গণনা ও পরিবহণের সময় অসতর্কতার ফলে অনেক পোনার অঙ্গহানি হয়ে থাকে এবং এর ফলে এসব অসুস্থ পোনা থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না।

২০২৫

৬) অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় এই পোনা আহরণ করা হয়ে থাকে, ফলে এসব পোনা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ।

৭) নির্বিচারে চিংড়ি পোনা আহরণের ফলে উপকূলীয় নদীসমূহের জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণ ও গণনা: প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি পোনা আহরণ করা হয় এবং আহরণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দী জাল, ছাঁকনি জাল, ঠেলা জাল ও টানা জাল দ্বারা চিংড়ির পোনা ধরা হয়। বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের সময় পোনার মৃত্যুহার ও পোনার পীড়ন যাতে কম হয় এবং অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের পোনার মৃত্যুহার কমানো তথা উপকূলীয় নদীসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কতকগুলো বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা দরকার। পোনা ধরার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ হলো-

ক) পোনা ধরার জাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর পোনা সরিয়ে ফেলতে হবে।

খ) পোনা শনাক্তকরণ ও বাছাই এর কমপক্ষে ১ ঘন্টা পর পোনা গণনা করা উচিত যাতে পোনা পাত্রের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

গ) পোনা মজুদের পাত্র ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে সযত্নে রাখতে হবে এবং পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে কারণ অন্ধকারময় পরিবেশ পোনার জন্য কম পীড়াদায়ক।

ঘ) পোনা মজুদ পাত্রের পানি ঘন ঘন বদলানো এবং বেশি ঘনত্বে পোনা রাখা ঠিক নয়।

ঙ) আহরিত পোনা থেকে বাগদা পোনা আলাদা করে অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির পোনা যত্ন সহকারে পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

সাধারণত প্রাকৃতিক উৎসের পোনা ঝিনুক দিয়ে একটি একটি করে গণনা করা হয়। এতে পোনা গণনা করতে বেশি সময় লাগে এবং অধিক পীড়ন পড়ে। ফলে পোনা পরিবহণকালে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুহার বেশি হয়। অল্প সময়ে বেশি পোনা গণনার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়:

ক) ৩০০ অথবা ৫০০ লিটারের গোলাকার ট্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দ্বারা পূর্ণ করে তাতে গণনার জন্য প্রয়োজনীয় পোনা ছাড়তে হবে।

খ) তারপর ট্যাংকের পানি প্যাডেল দ্বারা ওপর নিচে ঘুরাতে হবে।

গ) দ্রুত ১ লিটার পানি নিয়ে তাতে কতটা পোনা আছে তা ভালোভাবে গণনা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার এক লিটার করে পানি দিয়ে পোনা গণনা করতে হবে এবং গড়ে এক লিটার পানিতে কি পরিমাণ পোনা আছে তা হিসাব করে বের করে নিতে হবে।

এছাড়া আমাদের দেশে বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক বাগদার পোনার নার্সারি গড়ে উঠেছে। এসব নার্সারিতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত পোনা সংগ্রহ করে মজুদ করা হয় এবং ৩-৪ দিন নার্সারিতে বিশেষ যত্নে বা ব্যবস্থাধীনে রাখা হয়। তারপর এসব পোনা বিক্রি করে দেওয়া হয়।

সারণি: প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত বাগদা চিংড়ির ভালো ও খারাপ পিএল-এর বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভালো পিএল	খারাপ পিএল
০১	দেহের রং	হালকা বাদামি বা স্বচ্ছ	লালচে বা নীল
০২	খোলস	পরিষ্কার	নোংরা
০৩	আচরণ (সমপরিমাণ লবণাক্ত ও মিঠাপানির মিশ্রণে)	৩০-৪৫ মিনিট বেঁচে থাকে	মারা যাবে
০৪	আচরণ (গোলাকার পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে)	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

হ্যাচারি বা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র: আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভেজাল পোনার প্রাপ্তি। সময়মত উন্নতমানের পোনা কেবল কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র থেকেই পাওয়া সম্ভব। হ্যাচারিতে বাগদার পোনা উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও চাষি পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার পর্যাপ্ততা এখনও চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা চাষের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

ক) সময়মত ও চাহিদামত পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা পাওয়া যায়।

খ) একই আকারের ও বয়সের পোনা পাওয়া যায়।

গ) সুস্থ-সবল পোনা পাওয়া যায়।

ঘ) নির্ভেজাল বাগদার পোনা পাওয়া যায়।

ঙ) এতে অন্য কোনো চিংড়ি বা রাক্ষুসে মাছের পোনা থাকে না।

চ) হ্যাচারি থেকে সহজেই পোনা অন্যত্র পরিবহণ করা যায়।

ছ) বাগদার পোনা শনাক্তকরণে কোনো সমস্যা হয় না।

উন্নত মানের পিএল শনাক্তকরণ

হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল প্রাপ্তির উৎস প্রধানত দু'টি-

১. প্রাকৃতিক উৎসের মাদার চিংড়ি থেকে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল; এবং

২. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিপালিত মাদার চিংড়ি থেকে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল।

তবে উন্নতমানের পিএল নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে-

১. পিএল-এর বয়স: পিএল-এর বয়স কমপক্ষে ১৪/১৫ দিন না হলে এদেরকে খামারের উন্মুক্ত পরিবেশে ধাতস্থ হওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়না। পিএল-এর বয়স ১৪/১৫ দিন হলে এর ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ১৩/১৪ মিলিমিটার এবং রোস্ট্রামের উর্ধাংশে ৫-৭ টি দাঁতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।



চিত্র-২.১৪: বাগদা চিংড়ির ভালো ও খারাপ পিএল

২. পিএল-এর বর্ণ: বাদামী, খয়েরি, সবুজাভ বা কালচে সবুজাভ বর্ণের ঈষদচ্ছ শরীরের পিএল উৎকৃষ্ট মানের বলে বিবেচনা করা হয়। তবে লাল, নীল বা কালো বর্ণের পিএল অসুস্থ পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।



চিত্র-২.১৫: বাগদা চিংড়ির পিএল-এর বর্ণ

৩. আলোর প্রতি আকর্ষণ: আলোর প্রতি সহজাত আকর্ষণ প্রবণতা (photo-taxis) পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পিএল-এর প্রতিটি পর্যায়ে আলোর প্রতি আকর্ষণের সহজাত প্রবণতা দেখা যায়। এ প্রবণতা নপ্লি পর্যায়ে সর্বাধিক, জুইয়া ও মাইসিস পর্যায়ে কিছুটা কম এবং পিএল পর্যায়ে আরো কম থাকে।

৪. পিএল-এর নড়াচড়া: পোনার স্বাভাবিক নড়াচড়া, সাঁতার কাটা, চঞ্চলতা, ছটফটে ভাব ও চলাফেরা করার প্রবণতা (movement) পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫. পিএল-এর আকৃতি: খামারে ছাড়ার উপযোগী পিএল ১৪ বা ১৫-এর আকৃতি কমপক্ষে ১৩-১৪ মিলিমিটার হওয়া উচিৎ। এর চেয়ে ছোট আকারের পোনা খামারে ছাড়ার জন্য বাছাই করা ঠিক নয়।

৬. পিএল-এর আকৃতির সমতা: একই মজুদে বিভিন্ন আকৃতির পোনা থাকলে এদের মধ্যে স্বজাতি ভক্ষণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ভালো ফলনের জন্য খামারে সম-আকৃতির পোনা মজুদের কোন বিকল্প নেই। হ্যাচারিতে একই ট্যাংকের পোনা সর্বদা সম-আকৃতি সম্পন্ন হওয়া সমীচীন।

৭. পিএল-এর বিভিন্ন শারিরিক বৈশিষ্ট্য:

- সুস্থ-সবল পিএল-এর শরীরে বা উপাঙ্গসমূহে কোন প্রকার দাগ, ক্ষতচিহ্ন বা আঘাতের চিহ্ন থাকে না এবং কোন উপাঙ্গ অসম্পূর্ণ বা ছেঁড়া থাকেনা।
- সুস্থ-সবল পিএল-এর এন্টিনিউল সোজা সম্মুখদিকে বিস্তৃত থাকে এবং পুচ্ছ পাখনা সুন্দরভাবে ছড়ানো থাকে।
- সুস্থ সবল পিএল-এর শরীর স্বচ্ছ, মসৃণ ও পরিস্কার থাকে।
- অসুস্থ দুর্বল পিএল-এর শরীরে বা উপাঙ্গসমূহে বিভিন্ন ধরনের দাগ থাকতে পারে, ক্ষতচিহ্ন বা আঘাতের চিহ্ন থাকতে পারে এবং কোন কোন উপাঙ্গ অসম্পূর্ণ বা ছেঁড়া থাকতে পারে।

গ. পোনা বা পিএল পরিবহণ পদ্ধতি

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে চিংড়ির পিএল এবং ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল পরিবহণ করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও স্বল্প দূরত্বে হাড়িতে করে রেণু বা পিএল আবার পলিথিন ব্যাগে জুভেনাইল ও ধানী বা চারা পোনা পরিবহণ করতে দেখা যায়। তবে সব সময়ই আধুনিক পদ্ধতিতে পিএল ও জুভেনাইল পরিবহণ অধিক নিরাপদ। পোনা পরিবহণের প্রচলিত নিয়মসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো:

সনাতন পদ্ধতি

ক) সাধারণভাবে হাড়ি বা ব্যারেলের ৩ ভাগের ২ ভাগ টিউবওয়েলের পানি নিয়ে তাতে পুকুরের কিছু পরিষ্কার পানি মেশাতে হবে।

খ) নদী বা খাল পথে পোনা পরিবহণের সুযোগ থাকলে নৌকায় পোনা পরিবহণ করা যায়।

গ) পোনা বা জুভেনাইল ভর্তি করে পাত্রের মুখ ঘন ফঁসের জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ঘ) পরিবহণকালে প্রতি ২-৩ ঘন্টা অন্তর পাত্রের ২/৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করলে ভালো হয়।

ঙ) পরিবহণের সময় হাত দিয়ে ব্যারেলের পানি ঝাঁকাতে হবে।

চ) হাড়িতে পোনা পরিবহণের সময় মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে পানি ঝাঁকাতে/আন্দোলিত করতে হবে।

আধুনিক পদ্ধতি

ক) পরিবহণের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তবে অনেক দূরে পিএল পরিবহণের ক্ষেত্রে জীবিত খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া বা প্রতি ৫০০ পিএল-এর জন্য একটি সিদ্ধ ডিমের কুসুমের ১/৮ অংশ খেতে দিতে হবে।

খ) পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র আছে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। একটি ব্যাগের ভেতর আরেকটি ব্যাগ ঢুকিয়ে কোণাগুলো শক্তভাবে বাঁধতে হবে, যেন সব স্থানে কোনো ক্রমেই রেণু বা পিএল আটকে না যায়। অতঃপর ব্যাগের ১/৩ অংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

গ) শুধুমাত্র পিএল পরিবহণের ক্ষেত্রে প্যাকিংয়ের পূর্বে আশ্রয়স্থল হিসেবে কিছু জলজ আগাছা ব্যাগের ভিতর দিতে হবে। এবার পিএল বা পোনা ব্যাগের ভিতর দিয়ে ২/৩ অংশ অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করতে হবে এবং পলিথিন ব্যাগের মুখ শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে। এক সাথে অনেক ব্যাগ পরিবহণ করা হলে ব্যাগগুলো তাপ অপরিবাহী কার্টুনে নিয়ে পরিবহণ করা অধিক নিরাপদ।



চিত্র ৩.১৬: পিএল পরিবহণ

পোনা টেকসইকরণ ও পরিবহণ

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ প্রভৃতির স্বল্পতা বা আধিক্য চিংড়ির মধ্যে পীড়ন সৃষ্টি করে যা রোগ সংক্রমণের কারণ/মৃত্যুর কারণ হতে পারে। হ্যাচারি বা নার্সারির নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনাগুলো নতুন পরিবেশে ছাড়া হয় যা সহনীয় হওয়া অতীব জরুরি। নতুন পরিবেশে খুবই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় বিধায় পোনাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। যাতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে চাপমুক্তভাবে অভ্যস্থ হতে পারে। যথেষ্ট সতর্কতার সাথে এই কাজটি সম্পাদন করা গেলে- মজুদের সময় পোনা শারীরিকভাবে চাপের সম্মুখীন হবে না। ফলে বেশিরভাগ পোনা সুস্থ থাকবে এবং মজুদকালীন মৃত্যুর হার কম হবে। অপরদিকে পোনা জীবিতের হার বৃদ্ধি পাবে যা বছর শেষে উৎপাদনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পরিবহণের সময় পোনার মলমূত্র ত্যাগের ফলে পরিবহণ পাত্রে যাতে কোনো গ্যাস (অ্যামোনিয়া) সৃষ্টি না হয় সেজন্য পোনাকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে না খাইয়ে রেখে পেট খালি করা হয় এবং পোনা যাতে প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহনশীল হতে পারে সে জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এটাই পোনা টেকসইকরণ। এক কথায় প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহনশীল করে পোনাকে টেকসই করে নেয়াটাই হলো টেকসইকরণ। টেকসই করে পোনা পরিবহণ করলে অধিক দূরত্বে পরিবহণ করা যায় এবং পোনার মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়।



চিত্র-২.১৭: পোনা টেকসইকরণ

টেকসইকরণ পদ্ধতিসমূহ

ক) পুকুরে হাপার মধ্যে: বেড় জাল দিয়ে পোনা ধরার পর জালের মধ্যে রেখে ১০-১৫ মিনিট পোনাকে ঝাপটা দিয়ে পুনরায় পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। পোনা পরিবহণের অন্তত ৫-৭ দিন পূর্ব থেকে ২-৩ দিন অন্তর দিনে একবার এই কাজটি কতে হবে। পরিবহণের কমপক্ষে ৮ ঘন্টা পূর্বে পোনা ধরে হাপার মধ্যে রাখতে হবে। এই সময় কোনো ধরনের খাবার হাপায় দেয়া যাবে না।

খ) গোলাকার ট্যাংক বা সিস্টার্ন : পোনা বিক্রির আগের দিন জাল দিয়ে পোনা ধরে ট্যাংক বা সিস্টার্নে রেখে পানির ফোয়ারা দিতে হবে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা। এই সময় সিস্টার্নে কোনো ধরনের খাবার দেয়া যাবে না।

গ) পুকুরে পোনা টেকসই: পোনা বিক্রির আগে যে পুকুরে পোনা টেকসই করা হয় তাকে পাকাই পুকুর বলে। পাকাই পুকুরের আয়তন ১০-৩০ শতাংশ এবং গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়। পাকাই পুকুরে পোনা টেকসই করতে ৩-৪ দিন সময় লাগে।

পিএল অভ্যস্থকরণের নিয়ামকসমূহ

পানিতে বিদ্যমান প্রায় সব ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণই (যেমন- তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ, অ্যালকালিনিটি, দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি) পোনা মজুদের সময় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। তার মধ্যে মাঠ পর্যায়ে পোনা ছাড়ার সময় যে ফ্যাক্টরগুলো অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় তাহলো- লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা। এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে বা জরুরি প্রয়োজনে চাষিরা হাত-মুখ দিয়েও এই দু'টি প্যারামিটারকে অনুভব করতে পারে। প্যারামিটারগুলোকে বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় নেয়া উচিৎ। যেমন- তাপমাত্রা বাড়ানো কমানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ১.৫ ডিগ্রি সে. এর বেশি হওয়া অনুচিত। লবণাক্ততা কমানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ৩ পিপিটি এবং বাড়ানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ১ পিপিটি এর বেশি হওয়া অনুচিত। এবং পিএইচ পরিবর্তনের মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ০.৫ এর বেশি হওয়া অনুচিত।

চিংড়ি ঘেরের অন্যান্য কাজগুলোর মতো পোনা মজুদের কাজটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেসাথে অধিকতর স্পর্শকাতর বিধায় কাজটি অসাবধানতা বা হালকাভাবে সম্পাদন করার কোন সুযোগ নেই। আর এক্ষেত্রে ভুল করা হলে অবশ্যই মজুদকালীন পোনা মৃত্যুর হার ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে, যা বছর শেষে উৎপাদনকেও ব্যাহত করবে। সুতরাং ঘেরের সকল কাজের পাশাপাশি মজুদ ব্যবস্থাপনার কাজটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করতে হবে যা চাষির সফল ও লাভজনক উৎপাদনে সহায়ক হবে।

পিএল অভ্যস্থকরণ: পোনা ছাড়ার পূর্বে ঘেরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা এবং পলিথিনের ভেতরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা পরীক্ষাপূর্বক পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। তারপর পলিথিন ব্যাগগুলো মুখ আটকানো অবস্থায় পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে এবং উপর থেকে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত ১০ মিনিট পানি ছিটাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১ থেকে ২ ডিগ্রি সে.-এর

২০২৫

বেশি না হয়। পলিথিনের মুখ খুলে, ভাঁজ খুলে এবং মুখ খোলা অবস্থায় উপর থেকে পলিথিনগুলোর মুখে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত ৩০ মিনিট পানি ছিটাতে হবে। ধীরে ধীরে পলির ভেতরের ও বাইরের পানির অবস্থা (লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ইত্যাদি) সমপর্যায়ে চলে আসবে এবং পোনাগুলো নতুন পানির সাথে অভ্যস্থ হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় খুবই সতর্কতার সাথে এবং একটু বেশি সময় নিয়ে করা উচিৎ।



চিত্র-২.১৮: পিএল অভ্যাস্থকরণ

পানি ছিটানোর ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি পলিথিন ব্যাগের পোনা ও পানিসহ দু'হাত দিয়ে কিছুটা উপরে উঠিয়ে পোনাগুলোর চলাচল দেখতে হবে। বেশিরভাগ পোনা পলিথিন ব্যাগের মাঝে ও উপরের স্তরে ভেসে বেড়াবে। পলির তলায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং মৃত পোনাগুলো জটলা পাকানো অবস্থায় থাকবে। উন্মুক্ত পলিথিন কাত করে তার মধ্যে কৃত্রিম স্রোতধারা দিলে স্রোতের বিপরীত দিকে পোনা বেরিয়ে আসবে। নার্সারি পুকুর আয়তনে বড় অর্থাৎ মোটামুটি ১০ শতাংশের অধিক হলে কয়েকটি স্থানে পোনা ছাড়তে হবে।

পিএল অবমুক্ত পূর্ব বিবেচ্য বিষয়: পোনার বাক্সগুলো অপেক্ষাকৃত অধিক ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয়। সকাল থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। প্রখর রোদের মধ্যে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘেরে পোনা মজুদ না করাই ভাল। কারণ এসময়ে সাধারণত পানির তাপমাত্রা বেশি থাকে। তাছাড়া মেঘলা দিন, নিম্নচাপ বা ভ্যাপসা আবহওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়। জরুরি প্রয়োজনে এ সময়েও পোনা ছাড়া যেতে পারে যদি-

- নার্সারিতে পানির গভীরতা এক হাতের বেশি থাকে,
- যথেষ্ঠ বাতাস থাকে এবং তা ঘেরের পানিতে ঢেউ খেলে,
- ঘেরের মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমাণে সেল্টার/আশ্রয় তৈরি করা থাকে।
- পোনা ভর্তি পলিতে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিলে।

১০২৫

সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায়

পিসিআর পরীক্ষিত পোনা বা বিশ্বস্থ হ্যাচারি থেকে ভাল পোনা মজুদ করা উচিত। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে পোনার গুণগত মান সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। মজুদের পূর্বে পোনার কিছু আচরণ/অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। এই দেখার কাজে অনেকে আঁতশ কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে। নিম্নে সবল ও দুর্বল পোনার কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো-

ক্রমিক	সবল পোনা	দুর্বল পোনা
১.	খোলসের রং উজ্জল, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক	খোলসের রং অনুজ্জল, অস্বচ্ছ ও অস্বাভাবিক ঘোলাটে
২.	উপাংগসমূহ দৃঢ় এবং স্বাভাবিক	উপাংগসমূহ অস্বাভাবিক, ভাংগা, অসম্পূর্ণ
৩.	খাদ্যনালী পূর্ণ	খাদ্যনালী অপূর্ণ
৪.	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	স্রোতের পক্ষে সাঁতার কাটে
৫.	বিরক্ত করলে দ্রুত লাফ দিয়ে সরে যায়	বিরক্ত করলেও দ্রুত সরে যায় না এবং খুবই দুর্বল চলাচল
৬.	পলিথিনের নীচে তলানীর মতো জমে থাকে না	পলিথিনের নীচে তলানীর মতো জমে থাকে

নিম্নলিখিত কারণে পোনা শোধন করার প্রয়োজন হয়-

ক) পোনাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য,

খ) পোনার পরিবহণকালীন আঘাতজনিত অবস্থার উন্নতির জন্য, এবং

গ) মজুদের পর যাতে সহজে রোগবালাইয়ে আক্রান্ত না হয়।

পোনা শোধনের উপায়সমূহ

ক. প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট বা পটাশ গুলে নিয়ে তাতে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে। অথবা

খ. প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০০ গ্রাম খাবার লবণ গুলে নিয়ে তাতে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে।

চিংড়ি পোনার পরিবহণ ঘনত্ব মূলত জাত, আকার, ওজন, তাপমাত্রা, শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। সাধারণতভাবে ৩৬×২০ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগ, ২০-৪০ লিটার ধারণক্ষমতার হাড়ি এবং ২০০ লিটার ধারণক্ষমতার ড্রাম চিংড়ি পোনা পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ি পিএল-এর (গলদা ও বাগদা) পরিবহণ ঘনত্ব সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি : চিংড়ি পিএল-এর পরিবহণ ঘনত্ব

পরিবহণ পদ্ধতি	বয়স	পরিবহণ ঘনত্ব	পরিবহণ সময়	মন্তব্য
অক্সিজেন ভর্তি পলিথিন ব্যাগ	১০-১৫ দিন	১০০০-১২০০টি/ ব্যাগ ১৫০০-২০০০টি / ব্যাগ ২৫০০-৩০০০টি/ ব্যাগ	১৮-২৪ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ৫-৬ ঘন্টা	ব্যাগের ১/৩ অংশ পানি এবং ২/৩ অংশ অক্সিজেন থাকতে হবে
সনাতন পদ্ধতি	১০-১৫ দিন	২৫০-৫০০টি/ লিটার পানিতে	১-১৫ ঘন্টা	

পরিবহণকালে পোনা মৃত্যুর কারণ: একাধিক কারণে পরিবহণকালে চিংড়ির পিএল মারা যেতে পারে। সাধারণত যেসব কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক) **অক্সিজেন ঘাটতি:** যদি অধিক ঘনত্বে পোনা পরিবহণ করা হয় তবে খুব দ্রুত পাত্রে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে পোনা/পিএল মারা যেতে পারে।

খ) **শারীরিক ক্ষত:** জাল টানা, ওজন ও গণনা করার সময় অথবা এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরের সময় চিংড়ির পিএল-এর শরীরে আঘাত লাগতে পারে, এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভেঙে যেতে পারে। দুর্বল ও শারীরিকভাবে ক্ষত এই সমস্ত পোনা পরিবহণকালে এবং পুকুরে মজুদের পরপরই মারা যেতে পারে।

গ) **অ্যামোনিয়া সৃষ্টি:** পরিবহণকালে চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইলের নিঃসৃত মলমূত্র পচনের ফলে পাত্রে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। যার ফলে পানি বিষাক্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে।

ঘ) **তাপমাত্রা:** পানির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পোনার অক্সিজেন চাহিদা বাড়ে। কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। পরিবহণকালে পাত্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পোনা মারা যেতে পারে।

ঙ) **পরিবহণ দুরত্ব:** পরিবহণ দুরত্ব যত বেশি হবে পোনা বা পিএল-এর উপর তত বেশি চাপ পড়ে। এভাবে পোনা বা পিএল যদি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, তবে পরিবহণকালে মৃত্যুহার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

চ) **টেকসই না করে পোনা পরিবহণ:** ধানী বা চারা পোনা টেকসই না করে পরিবহণ করলে এরা নাজুক থাকে। ফলে পরিবহণকালীন ধকল সহ্য করতে পারে না এবং অনেক পোনা মারা যায়।

ছ) **রোগাক্রান্ত ও দুর্বল পোনা পরিবহণ:** রোগাক্রান্ত ও দূর্বল পোনা পরিবহণ করলে মৃত্যুহার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

পরিবহণকালীন বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক) পানির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে চিংড়ি পোনার অক্সিজেন চাহিদা বাড়ে। তাই পরিবহণকালে পানির তাপমাত্রা কম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পাত্রের পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘন্টা পরিবহণ সময়কালে প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে বরফ মিশানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

খ) পিএল-এর আকার যত বড় হবে পরিবহণ ঘনত্ব তত কম হবে। সেই সাথে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) পেটে খাবার থাকলে চিংড়ি পোনার অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায়। তাছাড়া পেটে খাবার ভর্তি পোনা পরিবহণ করলে পরিবহণের সময় পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয়। সে জন্য পরিবহণের আগে টেকসইকরণ পদ্ধতিতে পোনার পেট খালি করে নিতে হবে।

ঘ) পরিবহণকালে পোনার অবস্থা খারাপ হতে পারে তা বিবেচনা করে প্রতিরোধকল্পে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে খাবার লবণ ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) ব্যাগে যাতে কোনো প্রকার চাপ না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চ) পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চটদ্বারা ঢেকে রাখতে হবে এবং পরিবহণকালে ব্যাগ/ পাতিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

ছ) পানি পরিবর্তনের সময় মিশ্রিত পানি এবং পাত্রের পানির তাপমাত্রা সমতায় নিয়ে আসতে হবে।

জ) একই ব্যাগ বা পাত্রে সমান আকারের পিএল পরিবহণ করতে হবে এবং পাত্রের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত পোনা পরিবহণ করা যাবে না।

ঝ) ব্যাগে যাতে কোনো শক্ত বস্তু যেমন- ধারালো টিনের টুকরা, পেরেক ইত্যাদির আঘাত না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিড়ি/ সিগারেটের আগুন থেকেও ব্যাগকে সাবধানে রাখতে হবে।

ঞ) পরিবহণের জন্য সঠিক সময় নির্ধারণ করে পরিবহণ করতে হবে যাতে করে মৃত্যুহার কোনোভাবেই বেশি না হয়।

ট) পরিবহণকালে পরিষ্কার পানি সাথে রাখা এবং বারবার পাত্রের কিনারা ধুয়ে দিতে হবে, যাতে পোনা পাত্রের গায়ে লেগে না যায়।

২০২৫

ঘ. পোনার মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর পুকুরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের পুর্বশর্ত। পোনা মজুদোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া চিংড়ির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। পোনা মজুদের পর উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো হলো-

১. পোনা/ পিএল-এর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ

পুকুরে মজুদের পর বিভিন্ন কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণ মজুদকৃত পোনা বা পিএল মারা যেতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- পরিবহণজনিত ত্রুটি, শারীরিক আঘাত, পানির বিষক্রিয়া এবং হঠাৎ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এসব কারণে পোনা/ পিএল ছাড়ার পর মজুদকৃত পোনা বা পিএল এর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

পোনা বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ করার উপায়: মরা পোনা পানির উপর ভেসে উঠে। তাই মরা পোনা পাড়ের কাছাকাছি দেখা যায় কিনা তা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। মরা পোনা পানি থেকে উঠিয়ে গণনার পর আবার সমপরিমাণ পোনা ছাড়তে হবে।

২. চিংড়ি চাষে পানি ব্যবস্থাপনা

যে কোনো জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী সার্থকভাবে চাষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানির কোনো বিকল্প নেই। অথচ সেই পানি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাই চিংড়ি চাষের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নত প্রচলিত পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ঘেরে চিংড়ি চাষের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এই পদ্ধতিতে খুব কম ঘেরেই খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ ঘেরেই প্রাকৃতিক উৎপাদন/উৎপাদনশীলতার উপরই চিংড়ির উৎপাদন নির্ভর করে। ঘেরের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষের জন্য অবশ্যই ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

চিংড়ির চলাফেরার জন্য, চিংড়ির নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য, চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য এবং চিংড়িকে রোগবালাই হতে মুক্ত রাখার জন্য পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নিচে বিভিন্ন বিষয়ে পানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাসমূহ হলো-

ক. চলাচলের জন্য পানি ব্যবস্থপনা

বেশিরভাগ উপকূলীয় ঘেরের তলদেশ অসমতল হওয়ায় ঘেরের সর্বত্র সমানভাবে পানি থাকে না। এমনকি কোনো কোনো ঘেরে দুই পাড়ের মাঝামাঝি ঘেরের প্রায় ৩০-৪০ ভাগ এলাকায় কোনো পানিই থাকে না। পানির গভীরতা কম ও স্বচ্ছতা বেশি থাকার ফলে ঘেরের তলদেশ পর্যন্ত সূর্যালোক পৌছায়। ফলে, নানা ধরনের উচ্চতর জলজ উদ্ভিদ (নাজাজ, কারা ইত্যাদি) জন্মে চিংড়ির চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। এসব

বিষয়সমূহ বিবেচনা করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ঘেরের অধিকাংশ এলাকা চাষের আওতার বাইরে থাকে। ফলে, চিংড়ির উৎপাদনের হারও অনেক কম হয়। এতএব ঘেরের সম্পূর্ণ এলাকা চাষযোগ্য করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হয়-

ক) ঘেরের সর্বত্র যাতে সমান গভীরতায় পানি রাখা যায় সেভাবে ঘের প্রস্তুত করতে হবে।

খ) ঘেরের পানির গভীরতা প্রায় এক মিটার এবং পানির স্বচ্ছতা ২৫-৩৫ সেমি এর মধ্যে রাখতে হবে, যেন ঘেরের তলায় সূর্যালোক না পৌঁছায়।

গ) ঘেরে জম্মানো যে কোনো উচ্চতর উদ্ভিদ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

খ. নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের জন্য পানিতে ৪ পিপিএম এর বেশি দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেন এক ধরনের গ্যাস। পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় গ্যাস, যথা: কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি দ্রবীভূত থাকে। অপ্রয়োজনীয় গ্যাসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মজুদকৃত চিংড়ি মারা যেতে পারে। পানির গ্যাস ধারণের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। যদি কোন কারণে অপ্রয়োজনীয় গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে। চিংড়ি চাষের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্যাসের সহনীয় মাত্রা নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি: পানিতে দ্রবীভুত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্যাসের সহনীয় মাত্রা

ক্রমিক	গ্যাসের নাম	সহনীয় মাত্রা	মন্তব্য
০১	দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-১০ পিপিএম	৪ পিপিএম-এর কম নয়
০২	কার্বন-ডাই-অক্সাইড	<৬.০ পিপিএম	পিএইচ কম হলে পরিমাণ বেড়ে যায়
০৩	হাইড্রোজেন সালফাইড	<০.০৩ পিপিএম	কম পিএইচ এ অধিক ক্ষতিকর
০৪	অ্যামোনিয়া	<০.০১ পিপিএম	উচ্চ পিএইচ এবং তাপমাত্রা অধিক ক্ষতিকর

পানিতে অপ্রয়োজনীয় গ্যাস-এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ হলো-

ক) পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে,

খ) পানিতে অক্সিজেন এর উৎপাদন/ পরিমাণ কমে গেলে,

গ) চিংড়ির অতিরিক্ত খোসা পাল্টানোর কারণে, এবং

ঘ) ঘেরের তলায় কাদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ।

জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ হলো-

ক) অতিরিক্ত জৈব সার ব্যবহারের ফলে,

খ) চিংড়িকে অপরিমিত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করলে, এবং

গ) কোনো কারণে পানির সব প্ল্যাংকটন হঠাৎ মরে গেলে।

পানিতে অপ্রয়োজনীয় গ্যাস ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে করণীয়-

ক) চিংড়ি ঘেরের পানিতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে জৈব সার প্রয়োগ না করা;

খ) ঘেরে খাবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া। কারণ অপরিমিত সম্পূরক খাবার ব্যবহারে যেমন আর্থিক ক্ষতি হয় তেমনি ঘেরের পানি দূষিত হয়;

গ) ঘেরে প্লাংকটন উৎপাদনের সহনশীল মাত্রা বজায় রাখা;

ঘ) পানিতে প্যাডেল হুইল অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা; এবং

ঙ) অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় যথারীতি পানি পরিবর্তন করা।

গ. প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

জলাশয়ের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বলতে পানিতে সাধারণত ফাইটোপ্লাংকটন-এর উৎপাদনের হারকে বুঝায়। ফাইটোপ্লাংকটন শুধু পানিতে প্রাথমিক খাদ্যের যোগান দেয় না, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিংড়ির শ্বাস গ্রহণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং ক্ষতিকর গ্যাসসমূহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পার্যপ্ত ফাইটোপ্লাংকটনের উপস্থিতি মাটির তলায় জন্মানো ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং পানিতে দ্রবীভূত অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ও ফসফরাস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পানিকে দুষণমুক্ত রাখে। এক কথায় চিংড়ির সঠিক উৎপাদনের জন্য পানির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা সহনশীল পর্যায়ে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশসহ বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। চিংড়ি খামারের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও তার সহনীয় মাত্রা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো–

সারণি: পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও তার সহনীয় মাত্রা

ক্রমিক	গুণাবলী	সহনীয় মাত্রা
০১	তাপমাত্রা	২৮-৩২ ডিগ্রী সে.
০২	লবণাক্ততা	১০-৩০ পিপিটি
০৩	রং	সবুজ, হলদে সবুজ অথবা বাদামি
০৪	গভীরতা	>১০০ সে.মি.
০৫	স্বচ্ছতা	৩০-৪০ সে.মি.
০৬	পিএইচ	৭.৫-৮.৫
০৭	অ্যালকালিনিটি	৮০-২০০ পিপিএম
০৮	নাইট্রেট	<২০ পিপিএম
০৯	ফসফেট	০.১০-০.২০ পিপিএম

তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা : পানির তাপমাত্রার হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চিংড়ির বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত হতে পারে, এমনকি চিংড়ি মারাও যেতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঘেরসমূহে পানির গভীরতা কম থাকার ফলে

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অতিরিক্ত সূর্যতাপ কিংবা হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে পানির তাপমাত্রায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ন্যায় লবণাক্ততার পরিবর্তনের ফলে চিংড়ির তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তবে হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে লবণাক্ততা এবং তাপমাত্রা উভয়েরই অস্বাভাবিক হ্রাস চিংড়ির ক্ষতির কারণ হতে পারে। পানির গভীরতা প্রায় ১ মিটার রাখা সম্ভব হলে এ ধরনের পরিবর্তনে চিংড়ির তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না ।

রং ও স্বচ্ছতা: সাধারণত পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের রঙের উপর পানির রং নির্ভর করে। ফাইটোপ্লাংকটনের রং কম লবণাক্ত পানিতে সবুজ অথবা হলদে সবুজ থাকে এবং অধিক লবণাক্ত পানিতে বাদামি হয়। ফাইটোপ্লাংকটনের ঘনত্ব যত বেশি হবে পানির স্বচ্ছতাও সেই হারে কমে যাবে। কাজেই পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ ধরে রাখার জন্য পানির রং ও স্বচ্ছতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পিএইচ ও অ্যালকালিনিটি: পানিতে পিএইচ -এর গুরুত্ব এত বেশি যে এক কথায় পিএইচ কে পানির পালস হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। আর পানিতে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতার যে সুপ্ত ক্ষমতা বিদ্যমান তা নির্ভর করে পানির অ্যালকালিনিটির উপর। চিংড়ির ভালো উৎপাদনের জন্য পানির এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে। কোনো কারণে পিএইচ ও অ্যালকালিনিটি কমে গেলে চুন ব্যবহারের মাধ্যমে তা বাড়ানো যেতে পারে। ঘেরে চিংড়ি থাকা অবস্থায় কৃষিজ চুন বা ডলো চুন ব্যবহার করা নিরাপদ।

পাথুরে কিংবা কলি চুন ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। পিএইচ-এর মান যদি ৭.৫ এর নিচে নেমে আসে কিংবা সকাল ও বিকালের পিএইচ-এর তারতম্য ০.৫ এর বেশি হয়, তাহলে অবশ্যই পানিতে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি (শতকে ০.৪-০.৫ কেজি) ডলো চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগের ফলে পিএইচ-এর সাথে সাথে অ্যালকালিনিটিও বৃদ্ধি পাবে। যদি কোনো কারণে পিএইচ বেড়ে ৯.০ এর অধিক হয়ে যায় তাহলে পানি পরিবর্তন করে পিএইচ কমাতে হবে। বৃষ্টির পানি অম্ল, তাই অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানির পিএইচ কমে যেতে পারে। সেজন্য বৃষ্টির পর পরই ঘেরে ডলো চুন প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্যোপাদান: পানির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা তথা ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশসহ বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এসব উপাদান সরবরাহের জন্য পানিতে সার প্রয়োগ অপরিহার্য। চিংড়ি চাষের জন্য ঘের প্রস্তুত করার সময় পানিতে একর প্রতি ২০-২৫ কেজি (শতকে ২০০-২৫০ গ্রাম) ইউরিয়া ও একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি (শতকে ৩০০-৩৫০ গ্রাম) টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিংড়ি পোনা মুজদ পরবর্তী প্রত্যেক মাসে একর প্রতি ১০-১২ কেজি (শতকে ১০০-১২০ গ্রাম) পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি চিংড়িকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়, তাহলে প্রথম দুই মাস পর সাধারণত সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

২০২৫

ঘ. প্লাংকটন মৃত্যু ও তার প্রতিকার

পানিতে কোনো খাদ্যোপাদান কিংবা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অভাব হলে বেশিরভাগ প্লাংকটন মারা যেতে পারে। প্লাংকটনের এই অস্বাভাবিক মারা যাওয়াকে প্লাংকটন ক্রাসও বলা হয়। এমতাবস্থায় পানি একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়, পানিতে ফোম হয় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমে গিয়ে চিংড়ির জন্য সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় দ্রুত পানি পরিবর্তন এবং পানিতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্লাংকটন ক্রাস প্রতিরোধকল্পে পানিতে নিয়মানুযায়ী চুন ও সার ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

ঙ. রোগ প্রতিরোধে পানি ব্যবস্থাপনা

যেকোনো পানিতেই চিংড়ির রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই কেবলমাত্র রোগ জীবাণু চিংড়িকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। যে পরিবেশ চিংড়ির বসবাসের জন্য অসহনশীল, সেই পরিবেশেই রোগ জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি বেশি হয় এবং চিংড়িকে আক্রমণ করতে সহায়ক হয়। চিংড়ির চলাফেরা কোনো কারণে অস্বাভাবিক কিংবা চিংড়িকে রোগাক্রান্ত মনে হলে তাৎক্ষণিকভাবে পানির পিএইচ, দ্রবীভুত অক্সিজেন ও অ্যালকালিনিটি পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি পরিবর্তনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রবেশকৃত পানির গুণগতমান সহনীয় পর্যায়ে থাকে। উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে জলাধারে পানি পরিশোধনপূর্বক ঘেরে সরবরাহ করা যেতে পারে। পানি পরিশোধনের জন্য ২০-২৫ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধের জন্য পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি সহনশীল মাত্রায় রাখতে হবে।

চ. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণে পানি ব্যবস্থাপনা

পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা চিংড়ি চাষের সফলতার ক্ষেত্রে অন্যতম মূল চাবিকাঠি। সাধারণত পানি ব্যবস্থাপনা তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখার প্রধান কারণ হচ্ছে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার বাড়ানো এবং স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি। পুকুরের পানির ভালো অবস্থা বলতে সাধারণত পানিতে পরিমিত অক্সিজেন ও অত্যন্ত কম বর্জ্যের উপস্থিতিকে বুঝায়। এই বর্জ্যের উৎস হচ্ছে চিংড়ির মল, অভুক্ত খাদ্য, শেওলা এবং অন্যান্য অনুবীক্ষণিক জীব। চিংড়ি চাষকালে প্রথম তৃতীয় মাস পর্যন্ত খাদ্যের প্রায় ৩০% এবং চতুর্থ মাস বা শেষ পর্যায়ে প্রায় ৫০% বর্জ্য হিসেবে পুকুরের তলায় জমা হয়। এর ফলে ক্ষতিকর শেওলার উৎপাদন ত্বরান্বিত হয় এবং একটা পর্যায়ে এসব ক্ষতিকর শেওলা মারা গিয়ে পানি দূষিত করে। ফলে চিংড়ির স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই পানির গুণগতমান বজায় রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা। এর ফলে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় থাকে, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত শেওলা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং নতুন পানির সাথে নতুন পুষ্টিকর পদার্থসমূহ পুকুরে সঞ্চালিত হয়। চিংড়ির

পোনা মজুদের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রথম মাসে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় একবার বা দুবার পানি পরিবর্তন করা ভাল। চিংড়ি চাষের পুরো সময়ে পোনা মজুদের ঘনত্ব, পানির গুণগতমান, লবণাক্ততা, প্লাংকটনের ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পানি পরিবর্তনের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্রত্যেকবার পানি পরিবর্তনের সময় মোট পানির ২০-৫০% পরিমাণ পরিবর্তন করা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনানুসারে প্রতিদিন ১০% পানি পরিবর্তন করা হয় এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতিদিনই ৩০% পানি পরিবর্তন করা হয়। পুকুরে চিংড়ির দেহের ওজন অনুসারে কী পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা উচিত তার তালিকা নিচের সারণিতে দেয়া হল-

সারণি: চিংড়ির মোট ওজন অনুসারে পানি পরিবর্তন হার

চিংড়ির মোট ওজন (গ্রাম/বর্গমিটার)	প্রতিদিন পানি পরিবর্তনের পরিমাণ (%)
২ গ্রামের কম	০
২-১০ গ্রাম	২
১১-২০ গ্রাম	৩
২১-৪০ গ্রাম	৫
৪১-৬০ গ্রাম	৭
৬১-৮০ গ্রাম	৯
৮১-১০০ গ্রাম	১২
১০১-১২০ গ্রাম	১৫
১২১-১৪০ গ্রাম	১৮
১৪০ গ্রামের বেশি	২০% বা তার বেশি

প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে ভাটার সময় প্রয়োজনে পুকুরের অর্ধেক পানি বের করে দিয়ে জোয়ারের সময় পানি ঢুকানো হয়। সাধারণত জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে মাত্র ৫-৬ দিনে ৫০-১০০% পানি পরিবর্তন করা সম্ভব। আধা-নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকমের পাম্প ব্যবহার করা হয় এবং জোয়ারের পানির ওপর কম নির্ভর করা হয়। আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে জোয়ারের সময় স্বাভাবিকভাবে পানি পরিবর্তন করা হয় তবে ভাটার সময় প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পানি দুভাবে পরিবর্তন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রয়োজন মত কিছুটা পানি বের করে দেয়া হয়। এবং পরে সেই পরিমাণ পানি ঢুকানো হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পুকুর/ ঘেরের একদিক দিয়ে পানি প্রবেশ করানো হয় এবং অপরদিক দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের সময় পানি পরিবর্তন না করে পানি নিষ্কাশন গেটের মুখে ফল বোর্ড স্থাপন করে পুকুরের ওপরের স্তরের পানি বের করে দেয়া উত্তম। এতে লবণাক্ততা হ্রাসের ঝুঁকি কমে যায়। সাধারণত পুকুর/ ঘেরে নিম্নবর্ণিত অবস্থাদি পরিলক্ষিত হলে পানি পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ক) সকাল (৬-৭টা) ও বিকাল (৩-৪টা) এই দুই সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত পিএইচের পার্থক্য ০.৫ থেকে অধিক বা পিএইচের মান ৮.৫ এর বেশি অথবা ৭.৫ এর কম হলে।

খ) পানির স্বচ্ছতা ৮০ সেমি (৩২ ইঞ্চি) এর বেশি অথবা ৩ সেমি এর কম হলে।

গ) পানি অত্যধিক ভারী ও গাঢ় হয়ে গেলে

ঘ) পানিতে অজৈব কণার পরিমাণ অধিক প্রতীয়মান হলে।

ঙ) পানির উপরিভাগে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বুদবুদ দেখা গেলে।

চ) পানিতে অ-আয়োনিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে।

ছ) এ্যারেটর চালানো অবস্থায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে।



চিত্র-৩.১৯: চিংড়ি ঘেরের পানির উৎস

ছ. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ

পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রধানত তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, খরতা ও ক্ষারত্ব, পিএইচ, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। পানিতে এসব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ না থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি ও বাঁচার হার কমে যায়।

তাপমাত্রা: সাধারণত তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব-বিপাকক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বাড়ে ঠিক তেমনি তাপমাত্রা কম হলে সমস্ত ক্রিয়া কমে যায়। এই জন্য দেখা যায় ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার চেয়ে ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় জলজ প্রাণীসমূহের অক্সিজেন চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা, দৈহিক বৃদ্ধির হার ইত্যাদি প্রায় দ্বিগুণ

দ্রুততার সাথে বেড়ে যায়। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনদের জন্য ২৫-৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা উত্তম। ২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার নিচে চিংড়ির বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০ ডিগ্রি সে. এর নিচে প্রায় থেমে যায়। পানির তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সে. এর নিচে এবং ৩৪ ডিগ্রি সে. এর উপরে হলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে।

তাপমাত্রা অত্যধিক হলে খাদ্য ও সার প্রয়োগ প্রয়োজন মত কম বা বেশি অথবা বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সনাতন ও হালকা উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির গভীরতা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। ফলে এ সমস্ত খামারে গরমের সময় পানির তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য খামারের ভিতরের পার্শ্বে চারদিকে বা কোণাকুণিভাবে নালা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনমত পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। নার্সারিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪-৬% এলাকাতে কচুরিপানা দেয়া যেতে পারে।

দ্রবীভূত অক্সিজেন: চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাগদা চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি। চিংড়ি চাষের পুকুরে ৫-৭ পিপিএম অক্সিজেন থাকা উত্তম। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নামলে চিংড়ি মারা যেতে শুরু করে এবং ১ পিপিএম এর কম হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত চিংড়ি মারা যাবে। পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভুত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বায়ুচাপের ওপর। সাধারণত তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি তিন ভাবে হয়ে থাকে, যথা- রাত্রিকালে উদ্ভিদের শ্বাস গ্রহণ, প্রাণিকুলের শ্বাস গ্রহণ এবং পচনশীল জৈব পদার্থের পচন। অক্সিজেন হ্রাসের কারণে চিংড়ির দৈহিক ক্লেশ, ক্ষুধামন্দা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে থাকে। পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণসমূহ হলো:

১) পানির উপর সরের মত বুদবুদ জমা হয়।
২) পুকুরের তলা থেকে বুদবুদের আকারে গ্যাস ভেসে উঠে।
৩) অধিকাংশ শামুক ও ঝিনুক পুকুরের কিনারায় চলে আসে।
৪) সমস্ত চিংড়ি সাঁতার কাটতে থাকে।
৫) মিশ্রচাষের পুকুর হলে মরা মাছের মুখ হা করা থাকবে ও ফুলকা ফেটে যাবে।
৬) সাধারণত মেঘলা দিনে, খুব গরম পড়লে এবং মধ্যরাত থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

পানিতে সবুজ উদ্ভিদ কণার (ফাইটোপ্লাংকটন) উপস্থিতিতে সূর্যালোকের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে থাকে। এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় ফাইটোপ্লাংকটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে থাকে। রাতের বেলায় যখন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। তাই যেসব পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটনের আধিক্য বেশি থাকে সে সব

পুকুরে সাধারণত বিকেল বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোর বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। ফাইটোপ্লাংকটন সমৃদ্ধ পকুরের উপরিভাগে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং তলদেশে কম থাকে। তবে নিম্নোক্ত উপায়ে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে-

ক) পানিতে ঢেউ এর সৃষ্টি করে, যেমন- সাঁতার কাটা, বাঁশ পেটানো ইত্যাদি।

খ) পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করে অর্থাৎ পানি পরিবর্তন করে।

গ) কৃত্রিমভাবে বায়ু সঞ্চালন করে। যেমন- এ্যারেটর বা প্যাডেল হুইল স্থাপন করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। পানিতে স্তর সৃষ্টি রোধে, বর্জ্য পদার্থ বের করা এবং অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে এ্যারেটর অত্যন্ত কার্যকর ভুমিকা পালন করে থাকে। পুকুরের চারদিকে ৪টি এ্যারেটর ব্যবহার করলে বর্জ্য পদার্থ ঠিকভাবে এক জায়গায় জমা হতে পারে। সবগুলো এ্যারেটর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সব এ্যারেটর একই দিকে ঘুরে। পুকুর পাড় থেকে এ্যারেটর ৫-১০ মিটার দূরে এবং একটি থেকে অন্যটি ৩০-৩৫ মিটার দূরে স্থাপন করতে হবে।

পানির লবণাক্ততা: বাগদা চিংড়ি প্রায় শূন্য থেকে ৭০ পিপিটি লবণাক্ততায় বেঁচে থাকতে পারে। তবে ১০-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় এদের দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয়। পানির লবণাক্ততা ২৫ পিপিটির বেশি হলে মিঠাপানি সরবরাহ করে পানির লবণাক্ততা কমাতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার বা স্যালাইনোমিটারের সাহায্যে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায়।

অ্যামোনিয়া: সাধারণত পুকুরের তলদেশে পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আধা-নিবিড় ও নিবিড় চাষের পুকুরে সাধারণত হঠাৎ করে ব্যাপক হারে ফাইটোপ্লাংকটনের মড়ক ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পচনের কারণে অ-আয়োনিত অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আয়োনিত (NH_4) ও অনায়নিত (NH_3) অবস্থায় অ্যামোনিয়া পানিতে বিদ্যমান থাকে। অনায়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্র ০.০২৫ মিগ্রা/ লিটার এর কম থাকতে হবে যা চিংড়ির জন্য সহনীয়। এতে উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.১ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ০.৪৫ পিপিএম এর বেশি হলে বৃদ্ধির হার অর্ধেকে নেমে আসে।

সাধারণত পানির পিএইচ বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি হওয়া উচিত নয়। অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি পিএইচ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে বিকাল বেলা পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোর বেলায় কম থাকে। পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং অত্যধিক সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে।

নাইট্রাইট (NO_2): নাইট্রাইট হচ্ছে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটের মধ্যবর্তী যৌগ। অনেক সময় এই যৌগ চিংড়ির ব্যাপক মড়ক ও দৈহিক হার হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নাইট্রাইটজনিত কারণে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে

দেয়। নাইট্রাইটের মাত্র ০.১ পিপিএম এর নিচে থাকা চিংড়ির জন্য নিরাপদ। তবে সাগরের পানিতে নাইট্রাইট কম বিষাক্ত। চিংড়ির ঘনত্ব হ্রাস ও পানি পরিবর্তন করে জিওলাইট এবং চরম বিপর্যয়ের সময় ৩.৩ কেজি/ শতাংশ/৩০ সেমি পানির গভীরতায় লবণ প্রয়োগ করে নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নাইট্রেট (NO_3): পানিতে নাইট্রেটের মাত্রা ২০ পিপিএম এর নিচে রাখা চিংড়ির জন্য উত্তম। নাইট্রেট্র চিংড়ির জন্য তেমন একটা বিষাক্ত নয়, বরং শেওলার জন্য একটি পুষ্টিকর উপাদান।

খরতা ও ক্ষারত্ব: পানিতে দ্রবীভূত বাইকার্বনেট ও কার্বনেট এর ঘনত্বই হলো ক্ষারত্ব। বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতকগুলো উপাদানের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যতম। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম-এর ঘনত্বকে খরতা বলে। খরতা ও ক্ষারত্বের মান হ্রাস-বৃদ্ধি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায় এবং পানির পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে। এর হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না এবং চিংড়ির খোলস বদলানো বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরতা ও ক্ষারত্বের মান ৪০-২০০ মিগ্রা/ লিটার হলে চিংড়ির জন্য ভালো। পুকুরের পানি পরিবর্তন করে এবং চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করে পানির খরতা ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পিএইচ: চিংড়ির জন্য পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ হওয়াই উত্তম। পানির পিএইচ মান ৫ পিপিএম এর কম হলে এবং ৯.৫ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। সাধারণত খামারে পানির পিএইচ-এর উপস্থিতির মাত্রা ফাইটোপ্লাংকটন, অব্যবহৃত খাদ্যের চর্বি ও ময়লা-আবর্জনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। দিনের বেলায় ফাইটোপ্লাংকটন সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার ফলে ভোর বেলা পিএইচ কমে যায়। পিএইচ এর দ্রুত উঠানামা চিংড়ির জন্য মোটেও ভালো নয়। পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়-

ক) চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়, ফলে চিংড়ি দূর্বল হয়ে মারা যায়।
খ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাবারে অরুচি ভাব দেখা দেয়।
গ) পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির উপর নিম্নোক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়-

ক) চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়, ফলে চিংড়ি দূর্বল হয়ে মারা যায়।
খ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাবারে অরুচি ভাব দেখা দেয়।
গ) পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।
ঘ) চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
ঙ) অভিস্রবণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
চ) চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়।

চুন ও জিপসাম প্রয়োগ করে পানির পিএইচ বাড়ানো যায় এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট (১ কেজি/ শতাংশ) অথবা তুঁতে (৬-১২ গ্রাম/ শতাংশ/৩০ সেমি গভীরতা) প্রয়োগ করে পানির পিএইচ কমানো যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S): সাধারণত পচনশীল জৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে পচা ডিমের গন্ধের অনুরূপ গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটির উপরিভাগে কালো আবরণের সৃষ্টি হয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ০.১-০.২ পিপিএম হলে চিংড়ি শরীরের ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণে অনীহাভাব দেখায়, ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ১ পিপিএম-এর বেশি হলে চিংড়ির মড়ক আরম্ভ হয়। পুকুরে অক্সিজেন বৃদ্ধি, সার ও খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা হ্রাস ও পিএইচ এর মাত্রা বৃদ্ধি করে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পুকুরের পানি পরিবর্তনের মাধ্যমেও হাইড্রোজেন সালফাইডজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

জ. সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সেক্কি ডিস্ক রিডিং নিয়ে সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করতে হবে। সেক্কি ডিস্ক ১২ ইঞ্চি পানিতে রাখার পর যদি সেক্কি ডিস্ক এর সাদা-কালো অংশ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে শতাংশ প্রতি ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০-৩০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। এ মাত্রায় সার প্রয়োগের ৫-৬ দিনের মধ্যে সেক্কি ডিস্ক-এর দৃশ্যমানতা না কমলে উপরোক্ত মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ সার আবার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর অর্থাৎ প্রতি পুর্ণিমা ও অমাবশ্যার সময় পানি পরিবর্তনের পর সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অজৈব সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। জৈব সার পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া জৈব ও অজৈব সার একসাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

৫. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

চিংড়ির নিয়মিত নমুনায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সর্বোপরি পর্যবেক্ষণ খুব জরুরি। প্রতি ১৫ দিন অন্তর চিংড়ি ধরে নমুনায়ন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সে সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সারণি : চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং করণীয়

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	করণীয়
০১	শিরায়/ পেটে খাবার আছে কি না	খাবার না থাকলে, কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবার প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে।
০২	খোলসের উপর সাদা চাকা চাকা দাগ আছে কিনা	চিংড়ির ভাইরাস হলো কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে এবং প্রয়োজনে চিংড়ি আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

০৩	ফুলকা কালো হয়ে গেছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, ঘেরে হররা/ পালা টেনে দিতে হবে এবং স্বল্প মাত্রায় চুন প্রয়োগে করতে হবে।
০৪	লেজ ফোলা এবং তাতে পানি জমা হয়েছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি হিসেবে পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট পানিতে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।
০৫	চিংড়ি দুর্বল/ সতেজ কিনা	দুর্বল চিংড়ি বেশি হলে কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং স্বল্প পরিমাণে চিংড়ি আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে।
০৬	খোলস নরম/ শক্ত কিনা	নরম চিংড়ির সংখ্যা বেশি হলে কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং চুন প্রয়োগে করতে হবে।
০৭	দেহের মাংস এবং খোলসের মধ্যে কোনো ফাঁকা আছে কিনা	ফাঁকা থাকলে খাবার প্রদানের তালিকা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ঝ. খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সাধারণত অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ, মজুদ ঘনত্ব বেশি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে চিংড়ির শরীরে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। চিংড়ির ঘনত্ব বেশি হলে খাদ্যাভাবও প্রকট হয়। ফলে কিছু কিছু চিংড়ি দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং দুর্বল ছোট চিংড়িগুলো খাদ্য প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এর ফলে দুর্বল চিংড়িগুলো ধীরে ধীরে আরও দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া অধিক ঘনত্বের কারণে জলীয় পরিবেশও দূষিত হয়ে পড়ে। চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ:

১) পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২) নির্ধারিত মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা।

৩) খামারের সুষম ও পরিমিত খাদ্য ব্যবহার।

৪) অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ রোধ।

৫) খামারে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও আহরণ সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখা।

৬) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুরে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার না করা। তবে একান্তভাবেই যদি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করতে হয় সে ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের মাত্রা নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি : পুকুরে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগমাত্রা

রাসায়নিক দ্রব্য	উদ্দেশ্য	মাত্রা
ফরমালিন	প্রাটোজোয়াসহ বাহ্যিক পরজীবী দমন	১৫-২৫ পিপিএম
ম্যালাকাইট গ্রীন	ফাংগাস, বাহ্যিক পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ	২-৪ পিপিএম
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	ফাংগাস, বাহ্যিক পরজীবী, শেওলা ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ	০.২৫-০.৫০ পিপিএম
সিমাজিন	শেওলা নিয়ন্ত্রণ	০.২৫ পিপিএম
ফিটকিরি	ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ	১০-২০ পিপিএম
জিপসাম	ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ	২৫০-১০০০ পিপিএম
কলিচুন	ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ	১০০-১০০০ পিপিএম

ঞ. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

সঠিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি সরবরাহ ও নির্গমন ব্যবস্থা যাতে ঠিকমত থাকে সেজন্য পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এসব গেটে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে তা সাথে সাথে অপসারণ করতে হবে। তাছাড়া গেটের পার্শ্বে বা তলা দিয়ে পানি চলাচল করলে তা সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশন গেটে স্থাপিত নেট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। এগুলো ত্রুটিপূর্ণ হলে চিংড়ি খামার থেকে বের হয়ে যেতে পারে কিংবা অবাঞ্ছিত প্রাণী খামারে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। বেষ্টনী বাঁধ ও পুকুরের বাঁধ নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। বাঁধে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে। খামারে অবকাঠামোসমূহ নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়েও খামার/ চিংড়ির ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

চিংড়ি চাষিরা প্রায়শ উল্লেখ করে থাকেন তাদের পুকুরে চিংড়ির উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। পুকুরে আশানুরূপ উৎপাদন হচ্ছে না এরকম একটি বাগদা চিংড়ির পুকুর পরিদর্শনপূর্বক চাষির জন্য তোমার মতামত/পরামর্শ প্রদান করো।

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
পরিদর্শনকৃত চিংড়ি খামারের নাম ও ঠিকানা	
পুকুরের মাটির ধরন	
পুকুরপাড়ে বিদ্যমান গাছপালার নাম	১. ২. ৩. ৪.
পানিতে আগাছা থাকলে তার নাম	১. ২. ৩.
পানির রঙ লিখ	
পানির গড় গভীরতা উল্লেখ কর	
পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ লিখ	
পানির পিএইচ কত?	
পানির প্রধান উৎস কি?	
পানির উপর কোন লাল/সবুজ স্তর আছে কিনা?	
চাষির মৎস্য/চিংড়ি চাষ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ আছে কিনা?	

নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

চিংড়ি চাষের পুকুরের পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীসমূহের নাম ও মাত্রা লিখ।

ক্রমিক	জলাশয়ের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ	গুণাবলীর নাম	মাত্রা
১.	ভৌত গুণাবলী		
২.	রাসায়নিক গুণাবলী		
৩.	জৈবিক গুণাবলী		

জব ১: রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে রোটেনন গুলানো ও বল বানানো।
- সঠিক পদ্ধতিতে রোটেনন প্রয়োগ করা।
- কাজ শেষে স্থানটি পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	চশমা	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০২	মাপার টেপ	৫০ মিটার	১টি
০৩	ক্যালকুলেটর	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৫	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৬	হাতল	কাঠ বা লোহার	১টি
০৭	প্লাস্টিকের গামলা	মাঝারি মাপের (১৫-২০ লিটার)	২টি
০৮	ঝুড়ি	মাঝারি মাপের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	রোটেনন পাউডার	উন্নত মানের (৯ মাত্রার)	৫০০ গ্রাম
০২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যুপ্যাকেট	১টি
০৩	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৪	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. রোটেনন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরে নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. পুকুরের জলায়তন নির্ণয়ের জন্য পানি বরাবর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা মেপে নাও।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে জলায়তন নির্ণয় করো। ফুটে মাপা হলে তাকে ৪৩৫.৬ দিয়ে ভাগ করে শতাংশ বের কর (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)।

৪. এবার ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে মোট রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. ব্যবহারিক খাতায় ছকে পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, জলায়তন ও রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করো।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	মোট জলায়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা (ফুট)	রোটেননের পরিমাণ (কেজি)
১৫০	৫৮	২০	৫	২.৫০

৬. মোট রোটেননের ৩ ভাগের ২ ভাগ রোটেনন হাড়িতে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ পানিতে গুলে পুরো পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৭. বাকী ১ ভাগ রোটেনন অল্প পানিতে নিয়ে গামলায় এমনভাবে গুলাও যাতে শুকনা দলা বা বল বানানো যায়। এভাবে তৈরিকৃত ছোট ছোট বল পুরো পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৮. ১০-১৫ মিনিট পর জাল টেনে আক্রান্ত মাছ ধরে ফেল।

৯. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- রোটেনন প্রয়োগের সময় অবশ্যই চোখে চশমা, হাতে গ্লোভস ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- রোটেনন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুরীকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: পুকুরে চুন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে চুন গুলানো ও সঠিক পদ্ধতিতে পুকুরে ছিটানো।
- কাজ শেষে স্থানটি যথাযথভাবে পরিষ্কার করা ও অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে রাখা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	চশমা (গগলস)	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০২	মাপার টেপ	৫০ মিটার	১টি
০৩	ক্যালকুলেটর	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	সিমেন্ট/এলুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৫	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৬	হাতল	কাঠ বা লোহার	১টি
০৭	ঝুড়ি	মাঝারি মাপের	১টি
০৮	প্লাস্টিকের মগ/বাটি	মাঝারি মাপের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	কলিচুন	উন্নত মানের	২০ কেজি
০২	ডলোচুন	উন্নত মানের	২০ কেজি
০৩	পাথুরে চুন	উন্নত মানের	২০ কেজি

২০২৫

০৪	ব্লিচিং পাউডার	উন্নত মানের	২ কেজি
০৫	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৬	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৭	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. চুন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরে নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. পুকুরের জলায়তন নির্ণয়ের জন্য পানি বরাবর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নাও।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে জলায়তন নির্ণয় কর। ফুটে মাপা হলে তাকে ৪৩৫.৬ দিয়ে ভাগ করে শতাংশ বের কর (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)।

৪. এবার ১ কেজি/শতাংশ জলায়তন হিসেবে মোট চুনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. ব্যবহারিক খাতায় ছকে পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, জলায়তন ও চুনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করো।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	মোট জলায়তন (শতাংশ)	রোটেননের পরিমাণ (কেজি)
১৫০	৫৮	২০	২০.০০

৬. মোট চুন সিমেন্টের চাড়ি বা কাটা ব্যারেলে রাখ এবং খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চুনের ওজনের প্রায় তিন গুণ পানি ঢাল। চুনে পানি দিলে সহসা গরম হয়ে পানি ফুটতে শুরু করবে। এ সময় পাত্রের কাছ থেকে দুরে সরে যাও।

৭. চুন ঠান্ডা হলে ব্যারেলে আরো প্রায় সম পরিমাণ পানি যোগ কর এবং হাতলের সাহায্যে নড়াচড়া করে মিশ্রিত কর। এবারে তরল চুন প্লাস্টিকের বালতিতে নিয়ে মগ বা বাটির সাহায্যে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৮. পুকুর শুকনা হলে ব্যারেলের পরিবর্তে আগের দিন রাতে সিমেন্টের চাড়ি বা মাটিতে চুন রেখে হালকা করে পানি ছিটিয়ে দিয়ে রেখে দাও। কয়েক ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে চুন ফেটে গুড়া পাউডারের মত হবে। চুন যথেষ্ট ঠান্ডা হলে ঝুড়িতে করে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৯. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- চুন ভিজানোর জন্য প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার না করা।
- চুনে প্রথম পানি দেয়ার সময় পাত্রের উপর চটের ছালা দিতে হবে।
- চুন ছিটনোর সময় অবশ্যই চোখে চশমা, হাতে গ্লোভস্ ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- চুন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরে চুন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: পুকুরে সার প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে সার গুলানো ও সঠিক পদ্ধতিতে পুকুরে ছিটানো।
- কাজ শেষে স্থানটি যথাযথভাবে পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে রাখা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	চশমা (গগলস)	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০২	মাপার টেপ	৫০ মিটার	১টি
০৩	ক্যালকুলেটর	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	সিমেন্ট/অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৫	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৬	হাতল	কাঠ বা লোহার	১টি
০৭	ঝুড়ি	মাঝারি মাপের	১টি
০৮	প্লাস্টিকের গামলা	মাঝারি মাপের (১৫-২০ লিটার)	২টি
০৯	সেক্কি ডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় **উপকরণ**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইউরিয়া	দেশে উৎপাদিত	১০ কেজি
০২	টিএসপি	দেশে উৎপাদিত	১০ কেজি
০৩	কম্পোস্ট	খামারে উৎপাদিত	২০ কেজি
০৪	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৫	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৬	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. সার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরে নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. পুকুরের জলায়তন নির্ণয়ের জন্য পানি বরাবর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নাও।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে জলায়তন নির্ণয় কর। ফুটে মাপা হলে তাকে ৪৩৫.৬ দিয়ে ভাগ করে শতাংশ বের কর (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)।

৪. এবার জলায়তন অনুয়ায়ী ইউরিয়া, টিএসপি ও কম্পোস্ট সারের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. টিএসপি একটি বালতি বা গামলায় ৩-৪ গুণ পানির মধ্যে ১২-১৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখ। অতঃপর প্রয়োগের সময় পরিমাণমত ইউরিয়া সার মিশিয়ে নাও।

৭. ভিজানো সার কাঠের হাতল দিয়ে নড়াচড়া করে সুন্দর করে মিশ্রিত করো।

৮. এবার মিশ্রিত সার বালতিতে নিয়ে মগ বা বাটির সাহায্যে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৯. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- সার ছিটনোর সময় অবশ্যই চোখে চশমা, হাতে গ্লোভস্ ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বৃষ্টি বা মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ না করাই উত্তম।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরে সার প্রয়োগে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: সেক্কি ডিস্কের সাহায্যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষাকরণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৪	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৫	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেক্কি ডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১টি
০২	মাপার টেপ	৫০ মিটার	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০২	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৩	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরে মাছচাষ হচ্ছে এমন একটি পুকুরে গমন করো।

২. পানি ঘোলা হয়নি পুকুরের এমন স্থানে ধীরে ধীরে কোমর সমান পানিতে নাম।

৩. সেক্কি ডিস্ক আস্তে আস্তে পানিতে নামাতে থাক এবং উপর থেকে দেখতে থাক কখন সেক্কি ডিস্কটি পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।।

৪. এবার সেক্কি ডিস্ক বাঁধা সুতা মিটার স্কেল দিয়ে মেপে সেক্কি ডিস্কের গভীরতা বের করো।

৫. অতঃপর পুকুরের আরো দু'টি স্থানে অনুরূপভাবে সেক্কি ডিস্কের গভীরতা নির্ণয় করো।

৬. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করো।

কাজের সতর্কতা

- প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের সময় অবশ্যই হাতে গ্লোভস ও মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- বৃষ্টি বা মেঘলা দিনে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের কাজ না করাই উত্তম।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরে সেক্কি ডিস্কের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: পুকুরের পানির অক্সিজেন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে পানি সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে অক্সিজেন মিটার পরিচালনা করা।
- কাজ শেষে স্থানটি পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	বিকার	স্বচ্ছ কাঁচের (২০০-৫০০ মিলি)	২টি
০২	কালো বোতল	প্লাস্টিক (২৫০-৫০০ মিলি)	৪টি
০৩	অক্সিজেন মিটার	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৫	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৬	ঝুড়ি	বাঁশের মানসম্পন্ন	২টি

(গ) প্রয়োজনীয় **উপকরন**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পটাশিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট	উন্নত মানের	৫০০ গ্রাম
০২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৩	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৪	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পানির অক্সিজেন পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. অক্সিজেন পরিমাপের জন্য যথাসম্ভব পুকুরের মাঝ থেকে বালতিতে পানি সংগ্রহ করো অথবা ল্যাবরেটরিতে এনে অক্সিজেন মাপার জন্য কালো বোতলে পানি সংগ্রহ করো।

৪. সংগৃহীত পানিতে অক্সিজেন মিটার ডুবিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করো।

৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পুকুরের পানির উপরের স্তরে অক্সিজেন অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে বিধায় সব স্তর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হবে।
- পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা কম হলে তার কারণ নির্ণয়পূর্বক তা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরের পানির অক্সিজেন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৬: পুকুরের পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- পানিতে ডুবানোর পর পিএইচ পেপার খুব সতর্কতার সাথে পিএইচ স্কেলের সাথে মিল করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজ শেষে অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	বিকার	স্বচ্ছ কাঁচের (২০০-৫০০ মিলি)	৩টি
০২	বালতি	প্লাস্টিক (১৫ লিটার)	১টি
০৩	পিএইচ মিটার	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	পিএইচ স্কেল ও পেপার	মানসম্পন্ন	১টি
০৫	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৬	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৭	কালো বোতল	প্লাস্টিক (২৫০-৫০০ মিলি)	৪টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	তেঁতুল	মানসম্মত	৫০০ গ্রাম
০২	চুন	সাধারণ	১০ কেজি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৫	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. পানির পিএইচ পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. পিএইচ পরিমাপের জন্য যথাসম্ভব পুকুরের মাঝ থেকে বালতিতে পানি সংগ্রহ করো অথবা ল্যাবরেটরিতে এনে অক্সিজেন মাপার জন্য কালো বোতলে পানি সংগ্রহ করো।

৩. সংগৃহীত পানিতে পিএইচ মিটার ডুবিয়ে উপরে উঠিয়ে দেখ পিএইচ পেপারের বর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এবার পিএইচ স্কেলের সাথে পরিবর্তিত পিএইচ পেপারের বর্ণ মিলিয়ে পুকুরের পানির পিএইচ-এর মাত্রা নির্ধারণ করো। অথবা পানিতে ডিজিটাল পিএইচ মিটার ডুবিয়ে সরাসরি পিএইচ-এর মাত্রা নির্ধারণ করো।

৪. পিএইচ-এর মান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম হলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করো এবং ৭ দিন পর আবার পিএইচ মেপে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করো।

৫. পিএইচ-এর মান আদর্শ মাত্রার চেয়ে বেশি হলে শতাংশে ৫০-৬০ গ্রাম হারে তেঁতুল গুলিয়ে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দাও। তেঁতুল না পাওয়া গেলে তেঁতুলের ডাল কেটে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রেখে পরের দিন সকালে তুলে ফেল। অথবা গভীর নলকূপের পানি পুকুরে দেয়া যেতে পারে।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পিএইচ পেপার পুকুরের পানিতে ডুবানোর পর উঠিয়ে পিএইচ স্কেলের সাথে মিলানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- পুকুরে চুন বা তেঁতুল দেয়ার পর পরই পরিমাপ করে দেখতে হবে যেন পিএইচ-এর মাত্রা ৬.৫-৮.৫-এর মধ্যে অবস্থান করে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরের পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

২০২৫

জব ৭: পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে পানি সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে থার্মোমিটার পরিচালনা করা।
- কাজ শেষে স্থানটি পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	বিকার	স্বচ্ছ কাঁচের (২০০-৫০০ মিলি)	২টি
০২	কালো বোতল	প্লাস্টিক (২৫০-৫০০ মিলি)	৪টি
০৩	থার্মোমিটার	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	বালতি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৫	স্টিলের বাটি	মাঝারি মাপের (২ লিটার)	২টি
০৬	এ্যারেটর	২ অশ্ব শক্তি	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় **উপকরণ**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বাঁশ	মাঝারি আকারের	১টি
০২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৩	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৪	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যথাসম্ভব পুকুরের মাঝ থেকে বালতিতে পানি সংগ্রহ করো এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করো। মনে রাখতে হবে পুকুরের উপর, মধ্য ও তলা থেকে পানি সংগ্রহ করে তাপমাত্রা মাপতে হবে।

৪. পানির তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সে.-এর উপরে হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি পরিবর্তন বা এ্যারেটর চালানোর মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে।

৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

কাজের সতর্কতা

- পুকুরের পানির উপরের স্তরের পানির তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা কমতে থাকে বিধায় সব স্তর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হবে।
- পুকুরে তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে তার কারণ নির্ণয়পূর্বক তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৮: চিংড়ির সুস্থ ও সবল পিএল নির্বাচনে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	আঁতশ কাঁচ	৫ সেমি	১টি
০২	প্লাস্টিকের গামলা/বালতি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০৩	স্কেল (স্টেনলেইস স্টিল)	১ ফুট	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় **উপকরণ**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	চিংড়ির পিএল	পিসিআর পরীক্ষিত পিএল	১০০টি
০২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৩	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৪	পেন্সিল	২ বি	২টি

২০২৫

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত নার্সারি পুকুরে গমন করো।

২. পরিবহণ ব্যাগ বা পাতিলে আনা চিংড়ির পিএল ঠান্ডা স্থানে রাখ।

৩. আঁতশ কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে পিএল-এর আচরণ/অবস্থা নিরীক্ষা করো। উপাংগসমূহ দৃঢ় এবং স্বাভাবিক কিনা, খাদ্যনালী পূর্ণ কিনা, স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটে কিনা এবং পিএলকে বিরক্ত করলে দ্রুত লাফ দিয়ে সরে যায় কিনা তা পরীক্ষা করো।

৪. তাছাড়া আঁতশ কাঁচ দিয়ে পিএল-এর খোলসের রং উজ্জল, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করো।

৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পলিথিনের নীচে তলানীর মতো পিএল জমে রয়েছে কিনা তা ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পিএল-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করার সময় আঁতশ কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস-এর ব্যবহার সতর্কতার সাথে করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ির সুস্থ ও সবল পিএল নির্বাচনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৯: চিংড়ির পিএল অভ্যস্থকরণের দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- সঠিকভাবে ও সময় নিয়ে পিএল অভ্যস্থ করা।
- পরিবহণ পাত্র বা ব্যাগ ও নার্সারি পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি
০২	থার্মোমিটার	মানসম্পন্ন	১টি
০৩	রিফ্রাক্টোমিটার	মানসম্পন্ন	১টি
০৪	বালতি	মাঝারি মাপের (২০ লিটার)	২টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০২	খাতা	৪০-৫০ পৃষ্ঠা	১টি
০৩	পেন্সিল	২ বি	২টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত নার্সারি পুকুরে গমন করো।
২. পরিবহণ ব্যাগ বা পাতিলে আনা চিংড়ির পিএল ঠান্ডা স্থানে রাখ।
৩. পোনা ছাড়ার পূর্বে ঘেরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা এবং পলিথিনের ভেতরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা পরীক্ষা করো।
৪. অতঃপর পলিথিন ব্যাগগুলো মুখ আটকানো অবস্থায় পানিতে ভাসিয়ে দাও এবং উপর থেকে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত ১০ মিনিট পানি ছিটাও।
৫. পলিথিনের মুখ খুলে ভাঁজ করো এবং মুখ খোলা অবস্থায় উপর থেকে পলিথিনগুলোর মুখে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত ৩০ মিনিট পানি ছিটাতে থাক। ফলে ধীরে ধীরে পলির ভেতর ও বাইরের পানির অবস্থা (লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ইত্যাদি) সমপর্যায়ে চলে আসবে এবং পোনাগুলো নতুন পানির সাথে অভ্যস্থ হয়ে যাবে।
৬. উন্মুক্ত পলিথিন কাত করে তার মধ্যে কৃত্রিম স্রোতধারা দাও, ফলে স্রোতের বিপরীত দিকে পোনা বেরিয়ে আসবে।
৭. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পিএল ছাড়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১ থেকে ২ ডিগ্রি সে.-এর বেশি না হয়।
- পিএল অভ্যস্থকরণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় খুবই সতর্কতার সাথে এবং একটু বেশি সময় নিয়ে করা উচিৎ।
- নার্সারি পুকুর আয়তনে বড় অর্থাৎ মোটামুটি ১০ শতাংশের অধিক হলে কয়েকটি স্থানে পিএল অবমুক্ত করতে হবে।
- মেঘলা দিনে বা প্রখর রৌদ্রের সময় পিএল ছাড়া যাবে না।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ির পিএল অভ্যস্থকরণের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী ২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন চিংড়িকে জায়ান্ট টাইগার শ্রিম্প বলে?
২. বাগদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হতে কত সময় লাগে?
৩. নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে কয়টি পোনা মজুদ করা হয়?
৪. বাগদা চাষের জন্য কি ধরনের মাটি উত্তম?
৫. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া উত্তম?
৬. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির পিএইচ কত হওয়া দরকার?
৭. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?
৮. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা কত হওয়া উচিত?
৯. নার্সারি পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া উত্তম?
১০. পানির স্বচ্ছতা কত সেন্টিমিটারের কম বা বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে?
১১. পুকুরের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির বেশি হলে চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে?
১২. চিংড়ি চাষের পুকুরে দ্রবীভুত অক্সিজেনের উত্তম মাত্রা কত?
১৩. ফাইটোপ্লাংকটন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন গ্যাস ত্যাগ করে?
১৪. সেক্কি ডিস্ক রিডিং কত হলে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের চাষযোগ্য ৫টি চিংড়ির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
২. আদর্শ ঘেরের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।
৩. রুপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লিখ।
৪. মাছ/চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর প্রজাতিরসমূহ উল্লেখ করো।
৫. বাগদা চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ উল্লেখ করো।
৬. বাগদা চিংড়ি খামারে নার্সারি পুকুর তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?
৭. বাগদা চিংড়ি খামারে বাসস্থান ও ভান্ডারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
৮. চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে অক্সিজেন ঘাটতির কারণগুলো লিখ।
৯. পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির উপর কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লিখ।
১০. চিংড়ি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী লিখ।
১১. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
২. চাষের ঘেরে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ বর্ণনা করো।
৩. বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগণ বর্ণনা করো।
৪. বাগদা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত পানির গুণাগণ বর্ণনা করো।
৫. বাগদা চিংড়ি খামারে নার্সারি পুকুর তৈরির কৌশল বর্ণনা করো।
৬. বাগদা চিংড়ি খামারে পালন পুকুর তৈরির কৌশল বর্ণনা করো।
৭. চিংড়ি চাষাবাদে পানির গুণাগুণ আলোচনা করো।
৮. পোনা মজুদোত্তর পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৯. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

Feed and Feed Management for Bagda Shrimp



বাগদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রয়োজন। পেশীকলা গঠন ও জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। চিংড়ির জীবনধারণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বংশ বিস্তারের জন্য আমিষ বা প্রোটিন, তৈল, চর্বি বা ফ্যাট, শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এ ছয় ধরনের পুষ্টি উপাদান অপরিহার্য।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাগদা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- খাদ্যের উপকরণগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য বা খাদ্য উপাদান চিহ্নিত করতে পারব।
- সম্পুরক খাদ্য তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য তৈরি করতে পারব।
- দৈহিক বৃদ্ধি অনুযায়ি খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারব।
- খামারে খাদ্য প্রয়োগের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।

৩। চিংড়ির খাদ্য খাদ্যভ্যাস

চিংড়ি সর্বভুক প্রাণী। বয়স, ঋতু, স্থান ও পরিবেশের কারণে এদের খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। চিংড়ি নিশাচর, নৈশভোজী ও পানির তলদেশের প্রাণী। সূর্যের আলো এড়িয়ে সাধারণত রাতেই খাবার খেতে পছন্দ করে। শ্যাওলা, বিবিধ প্রাণী কণা, পোকা-মাকড়, ছোট ছোট শামুক, ঝিনুক, ছোট ছোট মাছ, মাছের ডিম, মৃত প্রাণীর পঁচা অংশ, কেঁচো ইত্যাদি বাগদা চিংড়ির প্রধান খাদ্য। চিংড়ি স্বজাতিভোজী, যদি কখনো খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন সবল চিংড়ি অপেক্ষাকৃত দুর্বল চিংড়িকে ধরে খেয়ে ফেলে। এছাড়াও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে শুকনো মাছের গুঁড়া,সয়াবিন চুর্ণ, চালের খুদ, ভুট্টা, গম চুর্ণ বা আটা প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার খাদ্যের উৎপাদন ও নির্দিষ্ট মাত্রায় গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা চিংড়ি চাষে আশাতীত ফলন লাভ করা সম্ভব নয়। চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাসমূহ হলো:

ক) চিংড়ির বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

খ) চিংড়ির বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়।

গ) সময়মত নির্দিষ্ট আকারের চিংড়ি আহরণ করা যায়।

ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করে।

ঙ) একক ও মিশ্রচাষে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

৩.১ খাদ্যের প্রকারভেদ

দেহের পুষ্টি চাহিদা পুরণের জন্য চিংড়ি নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতিতে এরা সর্বভূক প্রাণী। খাদ্য গ্রহণে এদের কোনো বাছ-বিচার নেই। সাধারণত এরা সব ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকে। চিংড়ির খাদ্যকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- প্রাকৃতিক খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্য।

৩.১.১ প্রাকৃতিক খাদ্য

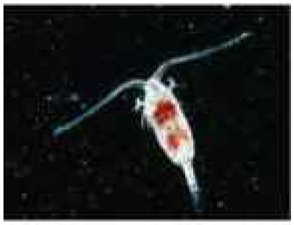
আমাদের দেশে উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুকুর প্রস্তুতকালীন এবং পরবর্তীতে খামার ব্যবস্থাপনার সময় জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য আবার দু'ধরনের-

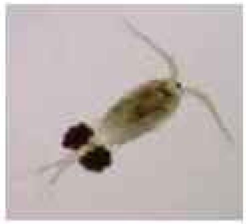
ক) প্রাণী প্লাংকটন: ডাফনিয়া, কপিপড, ক্লাডোসেরা, রটিফারস, সাইক্লপস, ব্রাইন শ্রিম্প ইত্যাদি।

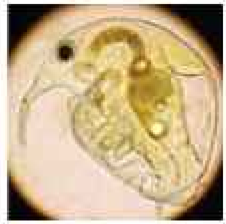
খ) উদ্ভিদ প্লাংকটন: সবুজ শেওলা, নাভিকুলা, ডায়াটমস, সুতাকার শেওলা ইত্যাদি।

২০২৫


ড্যাফনিয়া

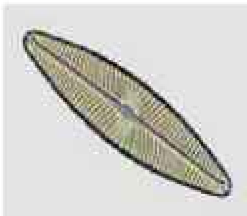

কপিপড

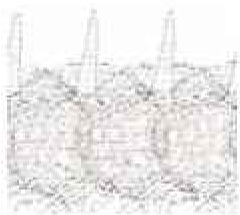

সাইক্লোপস

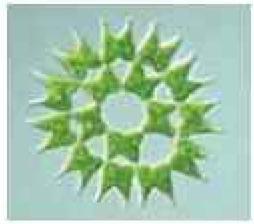

বসমিনা

চিত্র-৩.১: প্রাকৃতিক খাদ্য (প্রাণী প্লাংকটন)


সবুজ শেওলা


নাভিকুলা


ডায়াটমস


পেডিয়েস্ট্রাম

চিত্র-৩.১: প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ প্লাংকটন)

প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কৌশল: পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন (প্লাংকটন) নিশ্চিত করার জন্য ফারমেন্টেড অটোপলিশ (রাইস ব্রান), চিটাগুঁড় (মোলাসেস), ঈস্ট পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

সারণি: চিটাগুড়, অটোপলিশ ও ঈস্ট এর শতাংশ প্রতি মাত্রা

উপাদান	পরিমাণ (প্রতি শতাংশ)		প্রয়োগ পদ্ধতি	মন্তব্য
	১ম বার	২য় বার থেকে পরবর্তী		
চিটাগুঁড়	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চিটাগুড়, অটোপলিশ ও ঈস্ট আগের দিন একত্রে মিশিয়ে ৩-৫ গুণ পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে ঘন কাপড় দিয়ে ছেকে পানি সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।	৪-৫ দিন অন্তর অন্তর সার ব্যবহার করতে হবে। পানিতে প্রত্যাশিত রং (হালকা সবুজ, বাদামী সবুজ ইত্যাদি) না আসা পর্যন্ত ডোজটি অব্যাহত রাখতে হবে। চাষ পুকুরে পোনা মজুদের পর থেকে ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে।
অটো পালিশ	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম		
ঈস্ট	১ চা চামচ	আধা চা চামচ		

৩.১.২ সম্পূরক খাদ্য

অন্যান্য প্রাণীর মতই সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। চিংড়ির অধিক উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে পুকুর/ঘেরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা অপরিহার্য। সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগের ফলে চিংড়ির দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি প্রতিপালনের জন্য উচ্চ মাত্রায় আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করা আবশ্যক।

চিংড়ির খাদ্যে আমিষের পরিমাণ কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হতে হবে। চিংড়ি পোনা থেকে শুরু করে আহরণ পর্যন্ত নির্ধারিত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, পানিতে অক্সিজেন কমে যাওয়া, পিএইচ, এ্যালকালিনিটি, লবণাক্ততা, ইত্যাদির তারতম্য ও খোলস পরিবর্তনের ওপর চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ নির্ভর করে। লিফট নেট দিয়ে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। সম্পুরক খাদ্য ও ভাল ব্যবস্থাপনায় এক কেজি চিংড়ি উৎপাদনের জন্য ১.৩-১.৫ কেজি খাদ্য প্রয়োজন পড়ে। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের উপকারিতা-

১) অধিক ঘনত্বে চিংড়ি চাষ করা যায়;
২) চিংড়ির মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়;
৩) চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়;
৪) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
৫) অল্প সময়ে চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়; এবং
৬) অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ, খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ, বিভিন্ন জৈব ও পারিবেশিক অবস্থার কারণে ভিন্ন হয়। তাই খাদ্য প্রয়োগের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে-

১) চিংড়ির গড় ওজন;
২) পানির তাপমাত্রা;
৩) প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা;
৪) খাদ্যে পুষ্টির পরিমাণ, স্বাদ ও পানিতে দ্রবণের স্থায়িত্বশীলতা;
৫) খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি (কতবার, সময় ও পরিমাণ) এবং খাদ্য গ্রহণের হার পর্যবেক্ষণ;
৬) খামার পরিচালনাকারীর জ্ঞান ও দক্ষতা, এবং
৭) চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সময়, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা এবং খাদ্য গ্রহণের ধরন।

খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান না থাকলে চিংড়ি চাষে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হতে হয়-

১) চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ধীরে হবে;
২) বিভিন্ন উপাদানের অভাবের কারণে দেহে অস্বাভাবিকতা দেখা দিবে;

৩) চাষ সময় দীর্ঘায়িত হবে ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে ও উৎপাদন কমে যাবে;

৪) চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

খাদ্য প্রয়োগের হার কম হলে, সাধারণত নিম্নোক্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়:

১) সকল চিংড়ি সমানভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না;

২। চিংড়ি সমহারে বৃদ্ধি না হওয়ায় বিভিন্ন আকারের হবে;

৩) স্বজাতিভোজিতা (ক্যানাবলিজম) বৃদ্ধি পাবে;

৪) রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, এবং

৫) সর্বোপরি উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং খামার মালিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য প্রয়োগ করলে:

১) অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করলে অব্যবহৃত খাদ্য পঁচে পানি নষ্ট করে পরিবেশ দূষিত করবে;

২) মাটি ও পানির চাষপোযোগী উপাদানসমুহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে;

৩) চিংড়ির বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে, এবং

৪) চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে ব্যাপক মড়ক হতে পারে।

৩.২ সম্পুরক খাদ্যের উপাদান

আমাদের দেশে প্রাপ্য চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সমস্ত উপাদান সঠিক মাত্রায় মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পুরক খাদ্য তৈরি করা যায়। চিংড়ির স্বাস্থ্য ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্য কোনো অবস্থাতেই সম্পূরক খাদ্য তৈরির সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। চিংড়ির খাদ্য উপাদানসমূহ হলো-

ক. আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান: ফিশ মিল, মিট/বোন মিল, রেশমকীট মিল, চিংড়ির গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, ব্লাড মিল, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সয়াবিন মিল/খৈল, নারিকেলের খৈল, বাদামের খৈল ইত্যাদি।

খ. তৈল জাতীয় খাদ্য উপাদান: সয়াবিন তেল, মাছের তেল, সরিষার খৈল, তিলের খৈল ইত্যাদি।

গ. শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান: চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, গমের আটা, ভুট্টার আটা, চিটাগুড়, ক্ষুদিপানা, কুটিপানা, হেলেঞ্চা, বাঁধাকপির পাতা ইত্যাদি।

বাগদা চিংড়ির উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

ক. খাদ্য সহজেই গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

খ. সহজেই পরিপাক উপযোগী।

গ. চিংড়ির খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আমিষ, শর্করা, চর্বি, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, খনিজ পদার্থ মিনারেল থাকা আবশ্যক।

ঘ. খাদ্যে পুষ্টির অপচয় রোধকল্পে প্রস্তুতকৃত পিলেট খাবার যতটা সম্ভব শক্ত হওয়াই শ্রেয়। পিলেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত বাইন্ডার চিংড়ির জন্য যেন ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।


সয়াবিন মিল


সরিষার খৈল


ফিশমিল


চালের কুঁড়া


পিলেট খাদ্য


পিলেট খাদ্য


পিলেট খাদ্য

চিত্র-৩.২: বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ও চিংড়ির পিলেট খাদ্য

শ্রিম্প পিলেট তৈরির ক্ষেত্রে পিলেটের আকার ও পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি : পিলেটের আকার ও সাধারণ পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	নার্সারি	স্টার্টার	গ্রোয়ার	ফিনিসার
চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	০-০.৩	০.৩৫-৪.০	৪.০-১৮.০	১৮.০-২৩.০
পিলেটের আকার	মিহি, মধ্যম মানের, দানাদার	ছোট পিলেট	মাঝারি পিলেট	লম্বা পিলেট
পিলেটের ব্যাস	০.৫, ১.০, ২.০ মিমি	৩/৩২ ইঞ্চি	৩/৩২ ইঞ্চি	৩/৩২ ইঞ্চি বা ১/৮ ইঞ্চি
প্রোটিন (%)	৩৫	৩০-৩৫	২৫-৩০	২৫-২০
লিপিড (%)	৮	৮	৭	৬
অ্যাস (%)	৭	৭	৭	৬
আর্দ্রতা (%)	১০	১০	১০	১০
প্রয়োজনীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/ কেজি)	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০

৩.৩ চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি পদ্ধতি

সম্পূরক খাদ্য তৈরিতে খাদ্য উপকরণগুলোর শতকরা হার অনুযায়ী পরিমাপ করে ভালো করে মিশ্রিত করতে হয়। মিশ্রণের পরিমাণ নির্ভর করে খামারের আয়তন অনুযায়ী কি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করা হবে তার ওপর। উপকরণগুলো যথাসম্ভব চালনি দিয়ে চেলে নেয়া উচিত যাতে উপাদানগুলো সঠিকভাবে মিশ্রিত হয়। মিশ্রণকে শক্ত বড়ি বা পিলেট আকারে তৈরি করার জন্য বাইন্ডিং এজেন্ট হিসেবে চিটাগুড় বা বাইন্ডার পানিতে মিশিয়ে গরম করে নেয়া হয় এবং ক্রমাগত মিশ্রিত করে আঠার মতো করে নেওয়া হয়। তারপর খাদ্য উপাদানগুলো মেশিনের মাধ্যমে পিলেট আকারে তৈরি করা হয়। এ ছাড়া ভেজা পদ্ধতিতেও চিংড়ি খামারে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পূরক খাদ্য প্রতি দিনের মাত্রা বা পরিমাণ অনুযায়ী পানিতে এমনভাবে মিশাতে হয় যেন ছোট গোলাকার বলের মতো তৈরি করা যায়। পরে তৈরিকৃত বল জলাশয়ের নির্দিষ্ট স্থানে আস্তে আস্তে সরবরাহ করতে হয়। বাগদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য উদাহরণস্বরূপ নিচের সারণি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি: সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ (নমুনা)

খাদ্য উপাদান	পিএল ও জুভেনাইলের খাদ্য (৪০% আমিষ)		বড় চিংড়ি বা গ্রোয়ারের খাদ্য (৩৫% আমিষ)	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশমিল / প্রোটিন কনসেনট্রেট	৩৫.০০	২১.০০	২৫.০০	১৫.০০
মিট ও বোন মিল	২০.০০	১০.০০	২০.০০	১০.০০
সরিষা/তিলের খৈল	১৫.০০	৫.৫০	১৫.০০	৫.৫০
চালের কুঁড়া/ গমের ভূষি	১৫.০০	২.০০	২০.০০	২.৬০
ভুট্টার আটা	১০.০০	১.০০	১৫.০০	১.৫০
চিটাগুড়/ গমের আটা	৪.০০	-	৪.০০	-
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রন	১.০০	-	১.০০	-
মোট	১০০.০০	৪০.০০	১০০.০০	৩৫.০০



চিত্র-৩.৩: পিলেট তৈরির মেশিন

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত চিংড়ি খাদ্য ব্যবহার

মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ অনুসরণ করে খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা বা কোম্পানি থেকে খাদ্য ক্রয় করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উৎপাদিত খাদ্যের বস্তার উপরে লেবেলিং-এ কোন প্রজাতির চিংড়ির খাদ্য, খাদ্যের ধরন, খাদ্য উপাদানের তালিকা, ব্রান্ডের নাম, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর, পুষ্টি উপাদানের বিবরণ, প্রস্তুত এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ব্যাচ নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।

২০২৫

তৈরি খাদ্য ও খাদ্য উপাদান গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে অনুসরণীয় বিষয়াদি-

১) শুকনা পিলেট খাদ্য মুখ বন্ধ বায়ুরোধী পলিথিন বস্তা বা পাত্রে শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ু চলাচল করা স্থানে গুদামজাত/সংরক্ষণ করতে হবে।

২) গুদাম ঘরে খাদ্য সরাসরি মেঝে বা দেয়ালের সাথে না রেখে কাঠ বা বাঁশের পাটাতনের উপরে রাখতে হবে।

৩) গুদাম ঘরে খাদ্যের বস্তা একটির উপরে একটি (১০টির বেশি নয়) রাখতে হবে।

৪) প্রতিটি সারির বস্তার মাঝে কমপক্ষে ৩০ সেমি দুরত্ব রাখতে হবে যাতে সহজেই পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

৫) সংরক্ষিত খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০ শতাংশের নীচে রাখতে হবে (মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে)।

৬) শুষ্ক পিলেট খাবার প্লাষ্টিকের ব্যাগে বায়ুশুন্য অবস্থায় বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

৭) খাদ্য ও খাদ্য উপাদান সরাসরি সূর্যালোক, বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পায় এমন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮) সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য ১-২ মাসের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলা উচিত। তবে খাদ্যে এন্টিফাঙ্গাল এজেন্ট/অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করলে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

৯) খাদ্য গুদাম অবশ্যই ইদুর, ছুঁচো, বিড়াল ও তেলাপোকাসহ এ জাতীয় অন্যান্য প্রাণিমুক্ত হতে হবে।

১০) খাদ্য ব্যবহারে আগের খাদ্য আগে ব্যবহার করতে হবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না।

৩.৪ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের হার ও পদ্ধতি

চিংড়ি নৈশভোজী এবং সর্বভুক প্রাণী। এরা দিনে জলাশয়ের তলায় ও রাতে উপরে খাবারের সন্ধানে বের হয়। তাই সন্ধ্যায় খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সকালের চেয়ে কিছুটা বেশি হবে। পিএল এর ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার এবং পরবর্তীতে ১৫ দিনে একবার নমুনায়ন করে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। খাদ্য প্রয়োগের সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। ফিডিং ট্রে ব্যবহার করে খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা ও খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। লোহা, বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নীচে মশারির বা পলিষ্টার কাপড় দিয়ে ফিডিং ট্রে বা খাদ্যদানী তৈরি করা যেতে পারে।

সাধারণত ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬-৮টি ট্রে ব্যবহার করা উত্তম। ট্রে সাধারণত পাড়ের বকচর অথবা ঢালে স্থাপন করতে হবে। খাদ্য ট্রেতে উচ্ছিষ্ট খাবার থাকলে পরবর্তী খাদ্য প্রয়োগকালে খাবারের পারিমাণ কম করতে হবে এবং খাবার শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। খাবার ট্রে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

সারণি: খাদ্যের প্রকার, প্রয়োগ হার, প্রয়োগমাত্রা ও সময় এবং প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্যের প্রকার	প্রয়োগ হার	প্রয়োগ মাত্রা ও সময়	প্রয়োগ পদ্ধতি
পিএল-এর (নার্সারি) খাদ্য (পাউডার, মেশ ও সুক্ষ দানাদার খাদ্য)	চিংড়ির মোট দেহ ওজনের ১৫-১০%	দৈনিক ৩-৪ বার (সকাল, সন্ধ্যা ও রাত)	পুকুরের চারদিকে ৫-৭টি নির্দিষ্ট জায়গায় পাড়ের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে।
জুভেনাইলের (স্টার্টার) খাদ্য (ক্র্যাম্বল/ ফ্লেক/দানাদার খাদ্য) (০.৮-২.০ মিমি)	চিংড়ির মোট দেহ ওজনের ১০-৬ %	দৈনিক ২-৩ বার (সকাল, সন্ধ্যা ও রাত)	পুকুরের চারদিকে ৫-৭টি নির্দিষ্ট জায়গায় পাড়ের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে অথবা ট্রেতে রেখে প্রয়োগ করতে হবে।
খাবারযোগ্য চিংড়ির খাদ্য (গ্রোয়ার) (পিলেট/ দানাদার খাদ্য) (২.০-৪.০ মিমি)	চিংড়ির মোট দেহ ওজনের ৫-২.৫%	দৈনিক ২ বার (সকাল ও সন্ধ্যা বেলা)	পুকুরের চারদিকে ৪-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় পানির ১-২ ফুট নিচে চাটাই বা ট্রেতে রেখে প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি: চিংড়ির ওজন অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগের হার

চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)/ দিন
০.২ থেকে ১.০	১৫ থেকে ১৩
১.০ থেকে ২.০	১৩ থেকে ১১
২.০ থেকে ৩.০	১১ থেকে ৯
৩.০ থেকে ৫.০	৯ থেকে ৭
৫.০ থেকে ১৩.০	৭ থেকে ৫
১৩.০ থেকে ২০.০	৫ থেকে ৩
২০.০ থেকে ৩০.০	৩ থেকে ২

২০২৫

চিংড়ির প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রটি হলো:
প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ=মজুদকৃত পোনার সংখ্যা × বাঁচার হার (%) × গড় দেহের ওজন × দেহ ওজন অনুসারে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রার হার (%)।



চিত্র-৩.৪: ঘেরে ফিডিং ট্রের মাধ্যমে খাদ্য পরীক্ষা

চিংড়ির বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের পরিমাণও বাড়তে থাকে। চিংড়ির বয়স অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি: চিংড়ির বয়স অনুসারে প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ

পোনার বয়স (দিন)	প্রতি ১০০ পোনার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ (গ্রাম)	প্রতি ১০০০ পোনার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ (গ্রাম)
১ থেকে ৩০	২	২০
৩১ থেকে ৬০	১০	১০০
৬১ থেকে ৯০	১৫	১৫০
৯১ থেকে ১২০	৪০	৪০০
১২১ থেকে ১৫০	১০০	১০০০

৩.৫ খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে চিংড়ির পুকুরে বা জলাশয়ে তিন ভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োগ পদ্ধতি

ক্রম.	প্রয়োগ পদ্ধতি	খাদ্যের প্রকৃতি	সুবিধা-অসুবিধা
০১	ছিটিয়ে প্রয়োগ	কুঁড়া মিশ্রিত খাবার	এ পদ্ধতি চিংড়ির নার্সারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু চারা বা মজুদ পুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এতে অতিরিক্ত খাবার পুকুরের পানি দূষিত করে এবং খাদ্যের অপচয় হয়।
		পিলেট খাবার	পিলেট খাবারও পুকুরের কিনারে ছিটিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় ছিটানো পদ্ধতির চেয়ে খাদ্য অপচয় কম হয়। ধান ক্ষেতে চিংড়ির চাষ কিংবা পুকুরে স্বল্প পানি থাকা অবস্থায় বা ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।
০২	খাবার ট্রে বা পাত্র ব্যবহার পদ্ধতি	ভেজা বা পিলেট খাবার	পুকুরের বিভিন্ন স্থানে খাবার ট্রে ব্যবহার করে খাদ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য অপচয় কম হয় এবং অতি সহজেই অতিরিক্ত খাবার সরিয়ে ফেলা যায়। অপরদিকে অতি সহজেই চিংড়ির খাদ্যের চাহিদা নির্ণয় করা যায়।
০৩	সামান্য পানিতে ঝুরা খাবার মিশিয়ে দলাকৃতির খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি	ঝুরা খাবার	এ পদ্ধতিতে দলাকৃত খাদ্যগুলো পুকুরের স্বল্প গভীর এলাকায় ছুড়ে দিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়ও খাদ্যের অপচয় বেশি হয়ে থাকে এবং পানি দূষিত হতে পারে।

ফিডিং ট্রে: চিংড়ি পোনা একটু বড় হলে অর্থাৎ মজুদকৃত পোনার বয়স ৪ সপ্তাহ হলে ফিডিং ট্রে থেকে পোনার বাঁচার হার ও গড় ওজন জেনে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ফিডিং ট্রে দেখতে বর্গাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে এবং ট্রে বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি করা যায়। পুকুর বা ঘেরে কয়টি ট্রে স্থাপন করতে হবে তা নির্ভর করে পুকুরের আয়তনের ওপর। সাধারণত প্রতি হেক্টর আয়তনের পুকুরে ৬-৮টি ফিডিং ট্রে ব্যবহার করা হয়। ফিডিং ট্রে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিচের সারণি অনুসরণ করা যেতে পারে।



চিত্র-৩.৫: চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগে ফিডিং ট্রে

সারণি: ফিডিং/খাবার ট্রে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাবার নির্ধারণ

ট্রেতে পরিত্যক্ত খাবারের পরিমাণ	পুনঃখাবার নির্ধারণের পরিমাণ
০	৫% বৃদ্ধি
<৫	কোন পরিবর্তন নেই
৫-১০	৫% কমানো
১০-২৫	১০% কমানো
>২৫	খাবার বন্ধ করতে হবে, পুনরায় ১০% কম খাবার দিয়ে শুরু করতে হবে।

৩.৬ খাদ্য প্রয়োগের সময়

চিংড়ি নিশাচর প্রাণী এবং এরা সাধারণত রাতে খাবার গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য পরিবেশন সন্ধ্যা ও ভোর বেলায় করা শ্রেয়। চিংড়ি সাধারণত একই পরিমাণ খাবার খায় না এজন্য প্রতিবার খাদ্য প্রয়োগের সময় ট্রে বা পাত্রে অতিরিক্ত খাদ্য থাকলে তা তুলে ফেলতে হয় এবং শেষ হয়ে গেলে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হয়।





চিত্র-৩.৬: চিংড়ি ঘেরে ছিটিয়ে খাবার প্রয়োগ

নিম্নমানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার চিংড়ি ও ভোক্তার উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সঠিক খাদ্য নির্বাচনে চাষির করণীয়-

১) কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎসের খাদ্য ব্যবহার।

২) খাদ্যের উৎস নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) ব্যবহৃত উপাদানের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

৪) স্থানীয়ভাবে খাদ্য প্রস্তুতকালীন সময়ে অনুসরণীয় সতর্কতা অবলম্বন।

৫) কেবলমাত্র ক্ষতিকর জীবাণু ও রাসায়নিকমুক্ত উপাদান ব্যবহার করতে হবে।

৬) বাসি ও ছত্রাকযুক্ত উপাদান ব্যবহার করা যাবে না।

৭) মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না।

৮) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ও জীবানুমুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করতে হবে।

৯) খাদ্য তৈরিতে নিয়োজিত ব্যক্তি রোগমুক্ত হতে হবে।

১০) আমিষ জাতীয় কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করতে হবে।

১১) তৈরি খাবারের সবটুকু একবারে ব্যবহার করতে হবে।

১২) কেবলমাত্র অনুমোদিত ঔষধ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

১৩) কাজ শেষে অব্যবহৃত উপাদানসমুহ দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং আসবাবপত্র ভালভাবে জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করতে হবে।

খাদ্য সংরক্ষণের সময় অনুসরণীয় সতর্কতা

১) মেয়াদ উত্তীর্ণ, ভেজা বা খারাপ অবস্থায় সরবরাহকৃত খাদ্য কখনই ব্যবহার করা যাবে না।

২) কখনই ছত্রাকযুক্ত খাদ্য চিংড়িকে খাওয়ানো যাবে না।

৩) সঠিকভাবে লেবেল লাগিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৪) পরিষ্কার, শুষ্ক ও শীতল স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৫) সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী ও কীট পতঙ্গ থেকে খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে হবে।

৬) সংরক্ষণ স্থানে কোন কীটনাশক, সার, তেল, মবিল ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি রাখা যাবে না।

৭) সংরক্ষণের সময় ফার্স্ট-ইন ফার্স্ট-আউট নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৮) যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৯) ঔষধ মিশ্রিত খাদ্যকে স্বাভাবিক খাদ্য থেকে নিরাপদ দুরত্বে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০) কাঁচা খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ী-ভূড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ন, ইত্যাদি সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগ-জীবাণু (ভাইরাস, *Salmonella, Viblio cholerae, E.coli*) সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।

২০২৫

অনুসন্ধানমূলক কাজ

চিংড়ি চাষিরা প্রায়শ উল্লেখ করে থাকেন তাদের পুকুর/ঘেরে চিংড়ির উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ার অন্যতম কারণ সুষম খাদ্যের ব্যবহারে চাষির অনীহা বা উদাসীনতা। এরকম একটি বাগদা চিংড়ির পুকুর পরিদর্শনপূর্বক চাষির জন্য তোমার মতামত/পরামর্শ প্রদান করো:

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
পরিদর্শনকৃত চিংড়ি খামারের নাম ও ঠিকানা	
পুকুরের মাটি ও পানির ধরন	
পানির রং	
পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ	
পানির পিএইচ কত?	
পানির প্রধান উৎস কি?	
পুকুরে প্রয়োগকৃত খাবারের উপাদানসমূহ	১. ২. ৩. ৪.
খাদ্য উপাদানের শতকরা হার (%)	১. ২. ৩.

নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করো।

ক্রমিক	প্রাকৃতিক খাদ্যের ধরন	প্লাংকটনের নাম	প্লাংকটনের রং
১.	প্রাণী প্লাংকটন		
২.	উদ্ভিদ প্লাংকটন		

জব ১: বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক খাদ্য উপাদান শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, উপকরণ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী সম্পুরক খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০২	প্লাস্টিকের গামলা	১৫ লিটার	১টি
০৩	প্লাস্টিকের বালতি	১৫ লিটার	১টি
০৪	পাতিল	১০ লিটার	১টি
০৫	প্লাস্টিক মগ	মাঝারি আকারের (১ লিটার)	১টি
০৬	হাতল	কাঠ বা লোহার	১টি

২০২৫

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	বিভিন্ন খাদ্য উপাদান	উন্নত মানের	প্রয়োজন মাফিক
০২	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার থেকে ৫০০ গ্রাম করে ফিসমিল, চালের কুড়া, গমের ভূষি, ময়দা, সরিষার খৈল, সয়াবিন খৈল ও চিটা গুড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান পলিথিন ব্যাগে সংগ্রহ করো।

২. সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো পরীক্ষাগারে নিয়ে বিভিন্ন ট্রের উপর সারিবদ্ধভাবে পলিথিনে রাখ।

৩. পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে খাদ্য উপাদানগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

৪. প্রতিটি খাদ্য উপাদানের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং পর্যবেক্ষণের পদ্ধটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- খাদ্য উপাদানগুলো টাটকা না হলে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক থাকে না।
- খাদ্য উপাদানের সাথে কোন অপদ্রব্য মিশ্রিত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত সম্পুরক খাদ্য উপাদানসমূহ শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: ফিডিং ট্রেতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ কৌশলে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, উপকরণ ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী সম্পুরক খাদ্য সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের বালতি/ গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	হাফ ড্রাম	২৫ লিটার	১টি
০৩	ঝাঁকি জাল	মাঝারি আকারের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ফিডিং ট্রে	মাঝারি আকারের (১ বর্গ মিটার)	২টি
০২	সম্পুরক/পিলেট খাদ্য	সুষম খাদ্য	১০ কেজি

০৩	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০৪	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৫	টিসু পেপার	কিচেন টিসু প্যাকেট	১টি
০৬	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত নার্সারি পুকুরে গমন করো।

২. পুকুর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে মজুদকৃত মোট চিংড়ির ওজন নির্ণয় করো।

৩. অতঃপর মজুদকৃত মোট চিংড়ির ওজনের ৫-১০% হারে মোট খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ= মোট মজুদকৃত চিংড়ি × বেঁচে থাকার হার (%) × প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন × খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা (%)।

৪. এবার নির্ধারিত মোট খাদ্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করো। এক অংশ সকালে ও অবশিষ্ট অংশ সন্ধ্যায় ট্রে'র মাধ্যমে পুকুরে প্রয়োগ করো।

৫. সন্ধ্যায় খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে ফিডিং ট্রে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখ কোন খাদ্য অবশিষ্ট আছে কিনা। যদি খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তবে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে। আর যদি খাদ্য অবশিষ্ট না থাকে তবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

৬. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। খাদ্য মানসম্পন্ন না হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে।
- বড় পুকুরের ক্ষেত্রে একাধিক ফিডিং ট্রে স্থাপন করতে হবে। সাধারণভাবে প্রতি একরে ৩-৪টি ফিডিং ট্রে স্থাপন করা হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতা কম হয়।
- জোয়ার-ভাটা ও ঋতুচক্রের সাথে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

আত্মপ্রতিফলন

ফিডিং ট্রেতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ কৌশলে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী ৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি অনুযায়ী চিংড়ি কোন ধরনের প্রাণী?

২. উদ্ভিদ প্লাংকটন ও প্রাণী প্লাংকটন কোন ধরনের খাদ্য?

৩. নাভিকুলা, ডায়াটমস কোন ধরনের প্লাংকটন?

৪. ড্যাফনিয়া, কপিপড, রটিফারস প্রভৃতি কোন ধরনের প্লাংকটন?

৫. চিংড়ি চাষের প্রথম মাসে প্রতি ১০০টি পোনার জন্য প্রতিদিন কী পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়?

৬. এক হেক্টর আয়তনের জলাশয়ে কয়টি ফিডিং ট্রে দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

২. ১০টি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাংকটনের নাম লিখ।

৩. বাগদা চিংড়ির উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

৪. চিংড়ির বয়স অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ উল্লেখ করো।

৫. আমাদের দেশে প্রাপ্য চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির বিভিন্ন উপাদানসমূহ উল্লেখ করো।

৬. প্রতিদিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সময় সম্পর্কে লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির উপযোগী পিলেটের আকার ও সাধারণ পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো।

২. সম্পূরক খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৩. চিংড়ি খামারে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

বাগদা চিংড়ি আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ

Bagda Shrimp Harvesting, Processing and Marketing



বাগদা চিংড়ি চাষের শেষ ধাপ হচ্ছে চিংড়ির আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ। সঠিক সময়ে চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাত করতে না পারলে চিংড়ি চাষে আশানুরুপ লাভ পাওয়া যায় না। সাধারণত চিংড়ির গড় ওজন ও বাজারদরের ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি আহরণ করা হয়। তবে অনেক সময় চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে চিংড়ির ওজন ও বাজারদর বিবেচনা না করেই চিংড়ি আহরণ করা হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাগদা চিংড়ি আহরণের সময়কাল নির্ধারণ করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির আহরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- আহরিত চিংড়ির সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।

২০২৫

- আহরণকৃত চিংড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব।
- বাগদা চিংড়ির গ্রেডিং করতে পারব।
- চিংড়ি প্যাকেটজাতকরণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব।
- চিংড়ি কোটাজাতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- চিংড়ি বাজারজাতকরণের ধাপসমূহ উল্লেখ করতে পারব।
- উত্তম চিংড়ি চাষ অনুশীলনের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।

৪। চিংড়ি আহরণ

চিংড়ি খুবই স্পর্শকাতর জলজ প্রাণী। নতুন পানির স্পর্শ পেলেই এরা অধিক অক্সিজেনযুক্ত পানিতে এসে একত্রিত হয়। দিনে প্রচন্ড রোদের সময় পানি ঢোকানো হলে এরা পানি প্রবেশ গেটের মুখে চলে আসে। অনেক সময় পানি গরম হয়ে গেলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে। পানির গভীরতা কম এমন স্থানে চিংড়ি চলে আসার সম্ভাবনা থাকলে এ সময় চিংড়ি ধরা বন্ধ করা উচিত। চিংড়ি প্রতি অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার পর দেহ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে খোলস বদলায়। এ সময় চিংড়ি অত্যন্ত নরম থাকে। বাজারে নরম চিংড়ির চাহিদা ও দর তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এছাড়াও খাবারের অভাব বা চিংড়ির খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে চিংড়ির খোলস নরম হতে পারে। এসব কারণেই চিংড়ি ধরার পূর্বে নমুনায়ন করে পরীক্ষা করা ভালো। চিংড়ি ধরার পূর্বে চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আগাম প্রস্তুত রাখা উচিত। যাতে সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব হয়। সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব না হলে গুণগতমান বিনষ্ট হয় এবং বাজারে চাহিদা থাকে না।

৪.১ চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি

চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে চিংড়ির ঘেরের পারিবেশিক অবস্থা, ঘের বা জমির পরবর্তী ব্যবহার, পরবর্তী ফসলের সময়, চিংড়ির বাজারদর, পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা, প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধা, প্রভৃতি বিবেচনা করে চিংড়ি আহরণ করা উচিত। সাধারণত চিংড়ির বয়স ৩ থেকে ৪ মাস হলে চিংড়ি আহরণ করা আরম্ভ হয়। চিংড়ির খামার বা ঘেরে পর্যাপ্ত খাবার বিদ্যমান থাকলে এবং ঘেরের পরিবেশ চিংড়ির বৃদ্ধির অনুকুল হলে ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে প্রতিটি চিংড়ির ওজন ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রধানত দু'ভাবে চিংড়ি আহরণ করা হয়ে থাকে, যেমন- আংশিক আহরণ ও সম্পূর্ণ আহরণ।

৪.১.১ আংশিক আহরণ: এ পদ্ধতিতে ঘেরের চিংড়ি ১৫ থেকে ২০ গ্রেডের মধ্যে এলেই অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারে নতুন পানি ঢোকানোর সময় বড় আকারের চিংড়ি ধরা আরম্ভ হয়। জোয়ারের সময় নির্দিষ্ট স্থানে চিংড়ি আটকিয়ে ঝাঁকি জাল দিয়ে বা অন্য কোন প্রকার ছোট জাল ব্যবহারের মাধ্যমে আংশিক চিংড়ি ধরা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে শুধু বড় আকারের চিংড়ি ধরে ছোট চিংড়িসমূহ বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

২০২৫

সুবিধা

- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাজারজাত করা যায়।
- গ্রেড অনুযায়ী চিংড়ির আকার মোটামুটি একই রকম করা যায়।
- বাজারজাতকরণের ঝুঁকি কম থাকে।
- ঘেরের ছোট চিংড়ি বড় হওয়ার সুযোগ পায়।
- পরিবহণ পাত্র ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসপত্র কম লাগে।

অসুবিধা

- চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় হয়।
- কিছুটা সময় অপচয় হয়।
- পরিবহণ খরচ বেশি লাগে।

৪.১.২ সম্পূর্ণ আহরণ: এ পদ্ধতিতে খামারের পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে গেটে জাল পেতে ছোট-বড় সব রকম চিংড়ি ধরা হয়। চিংড়ি সম্পূর্ণভাবে ধরার জন্য ব্যাগ নেট, বেহুন্দি জাল, হাপা নেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘেরের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের পর স্কুপ নেট (scoop net) বা হাতের মাধ্যমেও চিংড়ি ধরা যেতে পারে।

সুবিধা

- খামারে নতুন ফসলের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সুবিধা হয়।
- চিংড়ি ধরার কাজে শ্রম বিনিয়োগ কম লাগে।
- ফসল পর্যায়ক্রম (crop rotation) করতে সুবিধা হয়।
- একসাথে সমস্ত চিংড়ি বাজারজাত করা যায়।

অসুবিধা

- অনেক চিংড়ি ছোট অবস্থায় থেকে যায় বা বড় হওয়ার সুযোগ পায় না।
- খামারে মোট উৎপাদন কিছুটা কম হয়ে থাকে।
- ছোট চিংড়ির বাজার চাহিদা কম হয়ে থাকে।
- চিংড়ি ধরার কাজে বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে।



চিত্র-৪.১: আহরণকৃত বাগদা চিংড়ি

৪.২ চিংড়ি আহরণ সরঞ্জাম

বাগদা চিংড়ি সাধারণত ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যেই আহরণের উপযুক্ত হয়ে থাকে। জলাশয়ের অবকাঠামোগত বৈচিত্রতা ও আহরণ উপকরণের কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাহন ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিংড়ি আহরণ বলতে প্রধানত বাজারজাতকরণের উপযোগী চিংড়ি ধরাকে বোঝানো হয় এবং চিংড়ি ধরার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে আহরণ উপকরণ বলা হয়। চিংড়ি আহরণ উপকরণসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন- চিংড়ি আহরণ বাহন বা ক্রাফট (craft) এবং চিংড়ি আহরণ উপকরণ বা গিয়ার (gear)। চিংড়ি আহরণ উপকরণসমূহকে এক কথায় ক্রাফট ও গিয়ার বলা হয়। মূলত একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি সাধারণত জলাশয়ের প্রকৃতি ও ধরনের ওপর নির্ভর করে। জলাশয়ের ধরন, প্রকৃতি ও কারিগরি বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা অনুসারে চিংড়ি আহরণ বাহন ও উপকরণ উভয়েরই প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো বাহনের প্রয়োজন হয় না। বাণিজ্যিকভাবে মুক্ত জলাশয় ও বৃহৎ চিংড়ি ঘের থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে বাহন ও উপকরণ উভয়েরই প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই চিংড়ি ধরার বা আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ, জাল ও বড়শি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৌশলগত দিক থেকে এসব আহরণ উপকরণসমূহের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তবে আমাদের দেশে বাগদা চিংড়ি আহরণে সাধারণত ৪টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো-

আটল/ফাঁদ পদ্ধতি: আটল বাঁশের তৈরি এক ধরনের ফাঁদ যা ব্যবহার করে চিংড়ি ধরা যায়। আটল বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে (২ থেকে ৩ ফুট)। আটল ঘেরের বিভিন্ন স্থানে এবং একটি থেকে আরেকটির

দুরত্ব প্রায় ৮ থেকে ১০ ফুট হয়ে থাকে। আটল সাধারণত জোয়ারের সময় যেস্থান দিয়ে পানি প্রবেশ ও নির্গমন হয় সেস্থানে বা ঘেরের গভীরতম স্থানে স্থাপন করা হয়। ইহা একটি সহজ ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। পাটা বা নেটের পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। এই ট্রাপ গোনের সময় ঘেরের গভীর স্থানে এবং গোঁই (ঘেরের যে স্থান দিয়ে জোয়ারের পানি ঢুকে ও বাহির হয়) এর ধারে স্থাপন করা হয়। এ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ অনেক সহজ এবং কম লোকবল দরকার হয়। কাঙ্ক্ষিত আকারের মেস সাইজ ব্যবহার করলে ছোট মাছ ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।



চিত্র-৪.২: আটল ব্যবহার করে চিংড়ি আহরণ

ঝাঁকি জাল পদ্ধতি: গোঁই বা ফাঁদে ধৃত চিংড়ির পরিমাণ কমে গেলে তখন ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে চিংড়ি আহরণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে ছোট চিংড়ি বার বার আসার সুযোগ থাকে। তাছাড়া শ্রমিকও বেশি লাগে। তবে এ পদ্ধতিতে চিংড়ি ধরার ১০-১৫ মিনিট পূর্বে খাদ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে প্রয়োগ করে চিংড়ি ধরা যায়।

বেড় জাল পদ্ধতি: যদি ঘের আয়তনে বড় হয় এবং বেশি পরিমাণ চিংড়ি ধরার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা উত্তম। কারণ জালের দৈর্ঘ্য বেশি হলে একদিকে যেমন জাল টানা সহজ হয়, তেমনি বেশিরভাগ চিংড়ি জালে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একই ঘেরে একদিনে দুই বারের বেশি বেড় জাল টানা উচিত নয়।

পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি: আবদ্ধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণের জন্য সবশেষে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ঘের শুকিয়ে অবশিষ্ট চিংড়ি ধরা হয়। এ পদ্ধতিতে ভোর বেলায় চিংড়ি আহরণ করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত কতিপয় চিংড়ি আহরণ উপকরণের নাম ও তার বর্ণনা দেয়া হলো-

৪.২.১ ফাঁদ (Trap)

চিংড়িকে জীবন্ত অবস্থায় ফাঁদের অভ্যন্তরে আটকে রেখে পানির উপরিভাগে তুলে চিংড়ি আহরণ করা হয়। সাধারণত অগভীর জলাশয়ে বা জোয়ার-ভাটার অঞ্চল বা জলাশয়ে পানি প্রবেশের মুখে ফাঁদ পেতে মাছ বা চিংড়ির পরিভ্রমণ পথে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়। ফাঁদ তৈরির মৌলিক দিক হিসেবে ফাঁদের মধ্যে চিংড়ি পানির গতির মাধ্যমে সহজেই ফাঁদের মুখ দিয়ে ফাঁদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু চিংড়ি পুনরায় উক্ত প্রবেশ পথ দিয়ে বের হতে পারে না। উল্লেখ্য, ফাঁদের পশ্চাৎভাগ বন্ধ থাকে এবং চিংড়ি সংগ্রহের সময় ফাঁদের পিছন দিক খুলে বা নির্দিষ্ট পথে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। ফাঁদের মাধ্যমে সাধারণত স্বল্প পরিমাণে বা পারিবারিক চাহিদা মিটানোর জন্য চিংড়ি আহরণ করা হয়। চিংড়ির প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে কখনো কখনো তা সংশ্লিষ্ট আহরণকারীর পেশা হিসেবেও গণ্য হয়।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত অধিকাংশ ফাঁদই বাঁশের তৈরি। তবে অনেক দেশেই বর্তমানে প্লাস্টিক নির্মিত সরু দন্ডের মাধ্যমে ফাঁদ নির্মাণ করা হয়। এলাকা বা অঞ্চলভেদে এবং চিংড়ির আহরণ উৎসের ধরন অনুসারে ফাঁদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিংড়ি ধরার জন্য প্যারন, ডারকি, বেনকি, ইচা চাই, আহকা প্রভৃতি ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট আকৃতির মাছ আহরণের ফাঁদের বিবরণ দেয়া হলো:

ক. অ্যান্টা (Anta)

গঠন প্রকৃতি: আকৃতিতে আয়তাকার এবং সাধারণত উচ্চতা প্রস্থের কিছুটা বেশি। মুলত বাঁশ দিয়ে অ্যান্টা তৈরি করা হয়। ফাঁদের উচ্চতা অংশের একদিকে চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী প্রবেশের জন্য এমনভাবে প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়, যাতে অতি সহজেই পানির গতির মাধ্যমে চিংড়ি ফাঁদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সহজে বের হতে পারে না। প্রবেশ পথ লম্বায় প্রায় অ্যান্টার মোট দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে থাকে। ফাঁদের একাংশে চিংড়ি আহরণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখা হয়। নির্দিষ্ট স্থান বন্ধ ও খোলার জন্য সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি: সাধারণত এ ধরনের ফাঁদের মাধ্যমে ছোট মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়। গতিশীল পানিতে চিংড়ি ধরার জন্য এ ধরনের ফাঁদ জলাশয়ে পানি প্রবেশের মুখে বা মোহনাঞ্চলের নদী-নালা বা মুক্ত জলাশয়ে পানির গতির বিপরীত দিকে মুখ করে প্রতিস্থাপন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে ফাঁদ পানির উপরে তুলে চিংড়ি আহরণ করা হয়। মুক্ত জলাশয়ে ফাঁদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁশের খুঁটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট গভীরতায় স্থাপন করা হয়। কোথাও কোথাও চিংড়ির গতি নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য ফাঁদের দু'পাশে ১২০ ডিগ্রি কোণ করে বানার ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে একই সাথে অনেকগুলো ফাঁদ বিভিন্ন গভীরতায় স্থাপন করা হয়।

বিস্তৃতি: বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে এ ধরনের ফাঁদের প্রচলন রয়েছে।

খ. বেনকি (Benki)

গঠন প্রকৃতি: আকৃতিতে আয়তকার, নিচের অংশ বেশ চ্যাপ্টা, তবে উপরের অংশ সরু হয়ে থাকে। অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী অংশ কিছুটা লম্বা এবং চিংড়ি প্রবেশের জন্য এক বা একাধিক প্রবেশ পথ থাকে। ফাঁদের উপরের অংশ কিছুটা লম্বা এবং চিংড়ি প্রবেশের অংশে চিংড়ি আহরণ পথ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে পথের ঢাকনা সহজেই খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

ব্যবহার পদ্ধতি: বেনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজপ্রাপ্য বাঁশের ফালি দিয়ে বিভিন্ন আকারের তৈরি করা হয়। ফাঁদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলাশয়ের ধরন ও প্রকৃতি অ্যান্টা ফাঁদের অনুরুপ। তবে এ ধরনের ফাঁদ এককভাবে বা একাধিক ফাঁদ কৌণিকভাবে সংযোগ করে একত্রে মাছ আহরণের জন্য স্থাপন করা হয়। সাধারণত এ ফাঁদের মাধ্যমে চিংড়ি ও ছোট প্রজাতির মাছ ধরা হয় ।

বিস্তৃতি: বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বেনকি ফাঁদের বিভিন্ন নাম লক্ষ্য করা যায়, যেমন- বেঞ্চি (benchi), দেউর (dheur), ধাইর (dhair) ইত্যাদি।

গ. ডারকি (Darki)

গঠন প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক থেকে এটি আয়তাকার হয়ে থাকে এবং এলাকাভেদে বিভিন্ন আকারের ডারকি প্রধানত বাঁশের চঞ্চুর সাহায্যে তৈরি করা হয়। ফাঁদের দরজা এর বক্ষ পাশের (উভয়দিকে) তলদেশে অবস্থিত। ফলে উভয়দিক থেকেই অর্থাৎ পানির গতিপথ পরিবর্তীত হলেও এ ফাঁদ লম্বালম্বিভাবে তলদেশ থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। পার্শ্বভাগে মাছ আহরণের দরজা বিদ্যমান।

ব্যবহার পদ্ধিতি: হাওর-বাঁওড়, নদী-নালা, খাল-বিল প্রভৃতি জলাশয়ে পানি প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে এই ফাঁদ পেতে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। প্রবাহমান পানিতে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ধরার ক্ষেত্রে এ ফাঁদের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

বিস্তৃতি: বাংলাদেশের সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বরিশাল, খুলনা, বৃহত্তর ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, সিলেট প্রভৃতি জেলাসমূহে এ ফাঁদের প্রচলন বেশি দেখা যায়।

ঘ. দোয়ার (Doir)

গঠন প্রকৃতি: দেখতে অনেকটা আয়তাকার, তলদেশ প্রশস্ত ও শীর্ষদেশ সরু এবং পাশের দুই প্রান্ত একই রেখা বরাবরে অবস্থান করে। এ ধরনের ফাঁদে দু'টি ফাঁদ দরজা থাকে। ফাঁদ দরজা দু'টি একই পাশে বা উভয় পাশে হতে পারে। ফাঁদ দরজা ফাঁদের তলদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফাঁদের উপরিভাগে মাছ আহরণের একটি ছিদ্র থাকে, যা অতি সহজেই খোলা ও বন্ধ করা যায়।

ব্যবহার পদ্ধতি: সাধারণত প্রবাহমান পানি এবং প্লাবনভুমি থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে দোয়ার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফাঁদ নালা বা জলাশয়ে পানি উঠা-নামার স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। ফাঁদের সম্মুখভাগের দিকে গাছের ডাল-পালা বা বানা দিয়ে এমনভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়, যাতে মাছ ও চিংড়ি প্রবাহমান পানির গতির মাধ্যমে ফাঁদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। গ্রাম্যাঞ্চলে বানার পরিবর্তে খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখাও ব্যবহার করা হয়।

বিস্তৃতি: বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে এ ধরনের ফাঁদের সাহায্যে প্লাবনভুমির মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা হয়।

ঙ. ইচা- চাই (Icha Chai)

গঠন প্রকৃতি: ইচা চাই অনেকটা ড্রাম আকৃতির এবং স্থানীয়ভাবে এটি বাঁশের চঞ্চু দিয়ে তৈরি করা হয়। পশ্চাৎভাগ অগ্রভাগের চেয়ে কিছুটা সরু। এ ফাঁদে পর পর দু'টি ফাঁদ দরজা থাকে। ফাঁদের পশ্চাৎ দিকে মাছ আহরণের দরজা থাকে।



চিত্র ৪.৩ ইচা- চাই

ব্যবহার পদ্ধতি: সাধারণত প্রবাহমান পানি ও প্লাবনভুমি থেকে চিংড়ি আহরণ করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। নালা ও জলাশয়ের পানি উঠানামার স্থানে এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার হয়। ফাঁদের সম্মুখভাগের দিকে গাছের ডালপালা বা বানা দিয়ে এমনভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় যাতে চিংড়ি ও অন্যান্য প্রাণী প্রবাহমান পানির গতির মাধ্যমে ফাঁদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

বিস্তৃতি: বাংলাদেশের সকল জেলায় এ ফাঁদের ব্যবহার দেখা যায়। তবে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ চাইয়ের প্রচলন বেশি। সাধারণত এ চাইয়ের মাধ্যমে ইচা ও অন্যান্য ছোট মাছ ধরা হয়।

চ. আহকা (Ahuka)

স্থানীয় নাম: বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে হোনচা (honcha), ময়মনসিংহ অঞ্চলে উচা (ucha), নোয়াখালী এবং রংপুর অঞ্চলে ঝাওই (jhaoi) নামে পরিচিত।

গঠন প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে ত্রিকোণাকৃতির এবং বাঁশের মাদুরের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত লম্বায় ১.২ থেকে ৩.০ মিটার এবং প্রস্থে ০.৮ থেকে ১.২ মিটার হয়ে থাকে। মূল ফাঁদের পশ্চাৎভাগ বন্ধ থাকে। ফাঁদ হাতের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য এক খন্ড বাঁশ মূল ফাঁদের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তী অংশে এবং পশ্চাৎভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাঁশ খন্ডের পিছনের অংশ ফাঁদের হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফাঁদের হাতল ফাঁদের মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেকের সমান।



চিত্র-৪.৪: আহকা (ahuka)

ব্যবহার পদ্ধতি: স্বল্প গভীর জলাশয়ে চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ফাঁদের মাধ্যমে চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে প্রধানত হাতের মাধ্যমে ফাঁদ পরিচালনা করা হয়। ফাঁদের অগ্রভাগ মাটির সাথে বা পানির তলদেশে পানির কাছাকাছি স্থাপন করে দ্রুত গতিতে সম্মুখের দিকে টানা হয় এবং কিছু সময় পর পর ফাঁদের মাথা পানির উপরিভাগে তুলে ফাঁদে চিংড়ি বা মাছ পড়েছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। সাধারণত ছোট আকৃতির চিংড়ি ধরার জন্য এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে চিংড়ি বা মাছ আহরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাঁদ ছোট-বড় সকলেই ব্যবহার করতে সক্ষম।

বিস্তৃত: বরিশাল, পটুয়াখালী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী এবং রংপুর অঞ্চলে এটি পাওয়া যায় ।

৪.২.২ জাল (Net)

চিংড়ি আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিংড়ি ও মাছ ধরার জন্য সাধারণত যে সমস্ত জাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক. বেহুন্দি জাল

স্থানীয় নাম: বেহুন্দি জাল, বিউটি জাল, খোর জাল ইত্যাদি ।

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং বরিশাল অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এর সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূলত এ জালের সাহায্যে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চিংড়ি ও চিংড়ির পোনা ধরা হয়।

জাল তৈরির উপকরণ: সাধারণত নাইলন সুতা দ্বারা বেহুন্দি জাল তৈরি করা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে এ ধরনের জাল মোচাকৃতি বা নলাকৃতির। লম্বায় বা দৈর্ঘ্যে ১৫ থেকে ৬০ মিটার এবং প্রস্থে ১০ থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ জালের ফাঁসের আকার ১.২৫ থেকে ২.৫ সেমি. হয়ে থাকে। অন্যান্য থলে জালের মতো এ জালের মুখের অগ্রভাগে পাখনা বা ডানা বিদ্যমান এবং ডানার দৈর্ঘ্য ৯ মিটার হয়ে থাকে। জালের থলের দৈর্ঘ্য ২০ মিটারের অধিক এবং জালের মুখের দিকের ফাঁসের আকৃতি ৪ সেমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মাছ ও চিংড়ি আহরণের কৌশল হিসেবে এ ধরনের জাল উপকূলবর্তী অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত নদ-নদীসমূহে স্রোতের বিপরীতে নৌকার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। একটি বড় ধরনের জাল প্রতিস্থাপনে ২০ থেকে

৩০ জন জেলের প্রয়োজন হয়। অগভীর অঞ্চলে জাল প্রতিস্থাপনের জন্য দু'টি বাঁশ বা কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়। জালের ডানা প্রতিস্থাপনের জন্য দৃঢ় কাঠের ফ্রেমের প্রয়োজন হয়। অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে এ ধরনের জাল প্রতিস্থাপনের জন্য নোঙর ব্যবহার করা হয়। জালের মুখ খোলা রাখার জন্য বাঁশের পুল বা খুঁটি ব্যবহার করা হয়।

আহরণকৃত চিংড়ি প্রজাতি: হন্নি চিংড়ি, রোম্লাই চিংড়ি, ছটকা চিংড়ি, চাকা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি।



চিত্র-৪.৫: বেহন্দি জাল (behundi jal)

খ. বেহতি জাল

স্থানীয় নাম: বিউটি জাল।

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এ ধরনের জালের মাধ্যমে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আহরণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ জালের প্রচলন অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

জাল তৈরির উপকরণ: সুতা বা নাইলন তন্তু দিয়ে এ ধরনের জাল তৈরি করা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে এটি নলাকৃতি বা মোচাকৃতির। এ জালের মুখের দু'পাশে মুখের ব্যাসের সমান প্রস্থ বিশিষ্ট পাখনা বা ডানা বিদ্যমান। ডানার দৈর্ঘ্য উভয়দিকে ৪ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ ধরনের জালের দৈর্ঘ্য ১২ থেকে ১৫ মিটার এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ

জালের ফাঁসের আকার সম্মুখভাগে প্রায় ১.২৫ সেমি.। জাল পরিচালনা ও প্রতিস্থাপনের জন্য ৩ থেকে ৪ জন আহরণকারী প্রয়োজন হয় এবং বাঁশের খুঁটি ও কাঠের ফ্রেমের মাধ্যমে স্রোতের বিপরীতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

গ. টার জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ জালের সাহায্যে চিংড়ি ধরা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলের উপকুলবর্তী এলাকায় এ ধরনের জাল দিয়ে চিংড়ি পোনা ধরা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক দিয়ে এ জাল আয়তাকার এবং নৌকার সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। জালের লম্বা দিক বাঁশের খুঁটির সাহায্যে দৃঢ় করা হয় এবং জালের খর্বাকার দিক নৌকার সম্মুখভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে। আয়তনগত দিক থেকে এ জালের দৈর্ঘ্য ৪.৫ থেকে ৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৫ থেকে ৪.৫ মিটার এবং জালের ফাঁসের আকার ০.৬ থেকে ১.২৫ সেমি. হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে মশারির নেট দিয়ে এ জাল তৈরি করা হয়।

জাল পরিচালনা পদ্ধতি: চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট মাছ ধরার সময় জালের খুঁটি হাতের সাহায্যে জালের অগ্রভাগ পানির নিচে পেতে রাখা হয় এবং কিছু সময় পর পর মাছের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে পানির উপরিভাগে তোলা হয় এবং মাছ আহরণ করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে এ ধরনের জাল ছাঁকি জালের (dip net) অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. খুচইন জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: বরিশাল, পটুয়াখালী ও আন্যান্য উপকুলবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের জাল দিয়ে অগভীর জলাশয়ের মাছ ও চিংড়ি এবং চিংড়ি পোনা ধরা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে এ ধরনের জাল ইংরেজি অক্ষর V এর অনুরুপ। সাধারণত তিনটি বাঁশের খুটি সংযুক্ত করে এ জালের অবকাঠামো বা ফ্রেম তৈরি করা হয় এবং অবকাঠামোর সাথে ঘন ফাঁসের মশারী নেট বা নাইলনের সুতা দিয়ে জাল তৈরি করা হয়। আকৃতিগত দিক থেকে জালের মুখ ফ্রেমের আয়তন অনুসারে ত্রিকোণাকার হয়ে থাকে। জালের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১.০ থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জাল ব্যবহার পদ্ধতি: এ জাল সাধারণত জলজ ভাসমান উদ্ভিদের নীচে স্থাপন করে হঠাৎ করে উপরের দিকে তুলে জালের মধ্য থেকে জলজ উদ্ভিদসমূহ সরিয়ে ফেলে মাছ আহরণ করা হয়। চিংড়ির পোনা আহরণের জন্য খুলনা অঞ্চলে জালের আকৃতি ডিম্বাকার বা চামুচাকৃতি হয়ে থাকে।

২০২৫

ঙ. আটনা জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে চট্রগাম অঞ্চলে এ ধরনের জালের প্রচলন অধিক দেখা যায়। সাধারণত এ জালের সাহায্যে ছোট আকৃতির মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়।

চ. চরপাতা জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এ জালের প্রচলন বেশি দেখা যায়। সাধারণত জোয়ার-ভাটা বাহিত অগভীর নদীসমুহে পানির গতিপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এ জালের সাহায্যে মাছ ধরা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: এ ধরনের জাল দৈর্ঘ্যে ৬ থেকে ১২ মিটার এবং প্রস্থে ৩ থেকে ৪ মিটার হয়ে থাকে। জালের ফাঁসের আকার ১.২৫ থেকে ২.৫০ সেমি. হয়ে থাকে। জালের উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে শক্ত দড়ি লাগানো থাকে, যাতে পানির অধিক গতিবেগের কারণে জাল ছিড়ে না যায়। ভাটার সময় এ জালের নিম্নপ্রান্ত জলাশয়ের তলদেশে খুঁটির সাহায্যে স্থাপন করা হয় এবং উপরের অংশ প্রান্তভূমির উপর ফেলে রাখা হয়। জোয়ারের সময় জালের উপরের প্রান্ত তুলে খুঁটির উপরের প্রান্তের সাথে বাঁধা হয়। পানি কমিয়ে হাতের সাহায্যে জালের মধ্য থেকে মাছ/ চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়।

৪.৩ চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি অত্যন্ত পচনশীল জীব। সাধারণত চিংড়ি ধরার ৩ থেকে ৫ ঘন্টার মধ্যেই চিংড়ির পচনক্রিয়া শুরু হয়। সেজন্য আহরণকৃত চিংড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করা উচিত। তবে চিংড়ি ধরার পরে বাজারজাতকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার জন্য নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে-

- আহরণকৃত চিংড়ির সাময়িক সংরক্ষণ স্থানের ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা হওয়া উচিত।
- সংরক্ষণ স্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়।
- চিংড়ি বাজারজাত করতে বা বিক্রয় স্থানে পৌছাতে ২ থেকে ৩ ঘন্টা দেরি হলে পূর্ব থেকেই বরফের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়।
- চিংড়ি পরিবহণের জন্য ঝুঁড়ি, পাতা, দড়ি ও চটের ব্যবস্থা করতে হয়।
- ধৃত চিংড়ি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয়।

- ছোট-বড় অনুযায়ী চিংড়ি গ্রেডে আলাদা করতে হয়।
- চিংড়ির মাথায় মুলত ব্যাক্টেরিয়া অবস্থান করে। কোনো কারণে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়লে বা মারা গেলে ব্যাক্টেরিয়াজনিত পচনক্রিয়া শুরু হয় এবং ধৃত চিংড়ির পচন ধরে। এ কারণেই যথাশীঘ্র চিংড়ির মাথা আলাদা করতে হয়।
- পরিষ্কার ঠান্ডা (৬.০ থেকে ৮.০ ডিগ্রি সে.) পানিতে ৫ থেকে ১০ মিনিট চিংড়ি ভিজিয়ে রাখলে চিংড়ির গুণগতমান ভাল থাকে। এ প্রক্রিয়াকে চিলিং বলা হয়।
- চিলিং করার পর পরিবহণ করার পূর্বে পরিবহণ পাত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়।
- চিংড়ি বরফজাত করার পূর্বে পাত্রের তলায় ও পাশে নরম কলার পাতা কিংবা ভেজা চট বিছিয়ে দিতে হয়, যাতে করে চিংড়ির গায়ে চাপ না লাগতে পারে।
- পাত্রে চিংড়ি ভরার সময় পাত্রের তলায় প্রথমে বরফ এবং পরে চিংড়ি পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ২:১ হওয়া উচিত।
- পাত্রের মুখ ভেজা চট দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিতে হয়।
- অতঃপর স্থানীয় বাজারে বা চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে।

৪.৩.১ চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে বেশি সময়ের জন্য চিংড়ি সংরক্ষণকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে গুণগত ও অবস্থানগত গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত করা গুণগত মানসমৃদ্ধ চিংড়ি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক. তাজা বা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ

চিংড়ির মৃত্যুর পর প্রধানত দু'টি কারণে চিংড়ি নষ্ট হয়ে থাকে, যেমন- রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে নষ্ট হওয়া ও ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হওয়া। রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিংড়ির মৃত্যুর পর দেহের কোষ থেকে অ্যামাইনো এসিড নিঃসৃত হয়। ফলে চিংড়ির খাদ্যগুণ ও স্বাদ বিনষ্ট হয় এবং ওজন হ্রাস পায়। অপরদিকে ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণুর আক্রমণে চিংড়ির মাংসল অংশে এনজাইমের জলায়ন (hydrolysis) ক্রিয়ার সাহায্যে নানা ধরনের ফ্যাটি এসিড নিঃসৃত হয়, যা স্বজারণ পদ্ধতিতে (auto oxidation) কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন করে, ফলে মাংসল অংশের পচনক্রিয়া শুরু হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এ কারণেই চিংড়ি ধরার ৫ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত।

বরফের সাহায্যে দীর্ঘ মেয়াদে চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১:১ (ওজনে) হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে বরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বরফের টুকরো অত্যন্ত ছোট বা পাতলা আবরণের মত হওয়া উচিত। অনেক সময় ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত অপরিশোধিত পানি দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহার বা ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত পাত্র ব্যবহারে চিংড়ির মান নষ্ট হতে পারে। এ ক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে ক্লোরিন মিশ্রিত পরিশোধিত পানির সাহায্যে তৈরি বরফ ব্যবহার করা উচিত এবং চিংড়ি সংরক্ষণে ও পরিবহণে ব্যবহৃত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ক্লোরিন মিশ্রিত পানি (৫ থেকে ১০ পিপিএম) দিয়ে ধোয়া উচিত। এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত চিংড়ির ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। চিংড়ি দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য সংরক্ষণে সমুদ্রের পরিষ্কার লোনা পানি ০ থেকে ১ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় গ্লুকোজ সিরাপ বা কর্ন সিরাপ প্রয়োগ করে তাপমাত্রা আরো কমানো হয়। এ ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চিংড়ির আকার অপরিবর্তিত থাকে এবং খরচও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জেট ফ্রিজিং পদ্ধতিতে চিংড়ি সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্রায়োজেনিক নাইট্রোজেন (cryogenic nitrogen) মাইনাস ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মাল্টিজুম (multi-zoom) ফ্রিজারের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে সাত হাজার ফুট হারে সঞ্চালিত করা হয়। ফলে ঠান্ডা জমানো হাওয়া এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে চিংড়ি কোষের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং অতি দ্রুত চিংড়ি সংরক্ষিত হয়।

খ. সিদ্ধ করা

এ পদ্ধতিতে প্রতি পাউন্ডে ১০০ টির অধিক সংখ্যক চিংড়ি লবণ জলে সিদ্ধ করা হয় এবং পরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক সাথে বেশ কিছু পরিমাণ চিংড়ি বড় তারের ঝুঁড়িতে রেখে সেগুলো ফুটন্ত ব্রাইন বা লোনা জলে ১ থেকে ২ মিনিট সিদ্ধ করা হয় এবং পরে তারের পাত্রটি তুলে কোন বড় তারের জালের উপর ভালভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে অতি দ্রুত সেগুলো ঠান্ডা হয়। এ প্রক্রিয়াকে ব্লাঞ্চিং (blanching) বলা হয়। ব্লাঞ্চিংকৃত চিংড়িগুলো অল্প সময়ের জন্য ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা জলে ডুবানো হয়। এ প্রক্রিয়াকে গ্লেজিং (glazing) বলা হয়।

গ. কৌটাজাতকরণ

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে কৌটাজাতকরণ একটি প্রচলিত ও প্রাচীন প্রথা। এ প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা করা চিংড়ি ব্রাইন বা লবণাক্ত পানি সহযোগে বায়ু নিরোধক পাত্র বা ক্যানে আবদ্ধ করে রপ্তানি করা হয়। ক্যান বা আবদ্ধ পাত্রে চিংড়ির গুণগতমান অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে লবণপানিতে সাইট্রিক এসিড (০.২%) মিশানো হয়। এ সময়ে দ্রবণের পিএইচ (pH) এর মান ৬.৪ হয়ে থাকে। ক্যানগুলো পরবর্তী ধাপে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ০.৭ কিলোগ্রাম ব্যাসযোগে ও ১১৫.৩ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ১৮-২০ মিনিট প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। কৌটাজাতকরণের ক্ষেত্রে লোহা বা তামার তৈরি ক্যান পরিহার করা উচিত। আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বা লবণাক্ত পানিতে প্রতি কিলোগ্রাম চিংড়ির জন্য ২৫০ মিলিগ্রাম

ডাইসোডিয়াম যৌগ ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি বা মাছ বিভিন্ন অবস্থায় রপ্তানি করা হয়, যেমন- মস্তকবিহীন, সম্পূর্ণ খোসা ছড়ানো, লেজ ছাড়া বাকী অংশের খোলস ছড়ানো, প্রভৃতি। মস্তকবিহীন চিংড়ি গ্রেড অনুসারে প্যাকিং করা হয়।



চিত্র-৪.৬ কোটাজাতকরণকৃত চিংড়ি (canned shrimp)

> গ্রেড: গ্রেড হলো প্রতি পাউন্ড চিংড়িতে কত সংখ্যক চিংড়ি বিদ্যামান। যেমন- গ্রেড ইউ-৫ এর অর্থ হলো প্রতি পাউন্ডে ৫টি বা তার কম সংখ্যক চিংড়ি বিদ্যমান। রপ্তানির ক্ষেত্রে চিংড়ির প্রচলিত গ্রেডগুলো হলো ইউ-১০, ইউ-১১ থেকে ইউ-১৫, ইউ-১৬ থেকে ইউ-২০, ইউ-২১ থেকে ইউ-২৫, ইত্যাদি।

৪.৩.২ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিংড়িকে দীর্ঘসময় গুণগত মানসম্পন্ন অবস্থায় সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। চিংড়ি সুষ্ঠু বিপণনের ক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিংড়ি নষ্ট বা পচে যাওয়ার উৎপাদকসমূহ বিশেষ করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রিয়া, ব্যাক্টেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ রোধ করা হয় এবং চিংড়ি সম্পদকে অবিকৃত অবস্থায় বিপণনের জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবসায়িকভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় এবং দূরত্ব নির্বিশেষে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত ৪টি ধাপ অনুসরণ করা হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ চারটি ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে চিংড়ি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. আহরণোত্তর চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগীকরণ

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রথম ধাপ হলো তাজা বা টাটকা চিংড়ি সংগ্রহ করে মাথা ছাড়ানো। সাধারণত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ি নিয়ে আসার পূর্বেই ফড়িয়া বা বেপারি বা আড়তদারগণ চিংড়ির মাথা ছাড়িয়ে ফেলে। সরাসরি খামার বা বাজার থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় আস্ত চিংড়ি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত কারখানায়ও চিংড়ির মাথা ছাড়ানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চিংড়ি পরিবহণ ও সাময়িক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বরফ সমৃদ্ধ গাড়ী বা পরিবহণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মাথা ছাড়ানোর উদ্দেশ্য হলো চিংড়ির মৃত্যুর পর মাথা সর্বপ্রথম ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, কেননা চিংড়ির মাথা ও তার কলাসমূহ মাংসপেশীর চেয়ে অধিক নরম। ফলে মাথা দ্রুত ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়াও চিংড়ি দেহের গঠনগত কারণে পরিবেশ থেকেই মাথার খোলসের মধ্যে কোন না কোন ধরনের ব্যাক্টেরিয়া বিদ্যমান থাকে। সেগুলো চিংড়ির মৃত্যুর পর পরই অধিক সক্রিয় হয়ে উঠে এবং চিংড়ির পচনক্রিয়া শুরু হয়।

খ. জীবাণুমুক্ত করা ও পচন রোধ করা

বরফে সংরক্ষণ করা: মাথা ছাড়ানোর পর চিংড়ি লেজসহ বাঁশ, কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি ক্রেটস বা বাক্সের মধ্যে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি ব্যাক্টেরিয়া মুক্ত থাকে এবং পচনক্রিয়া সংগঠিত হতে পারে না। বরফ দিয়ে চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১:১ রাখা হয়। সাধারণত বাজার থেকে বা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে চিংড়ি সংগ্রহকারীরা এভাবে চিংড়ি সাময়িক সংরক্ষণ করে ২-৩ দিন পর পর প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ করে থাকে।

মাথা ছাড়ানো চিংড়ি পরিষ্কার পানিতে ধৌত করা: চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছানোর পর মাথা ছাড়ানো বরফ সমৃদ্ধ চিংড়িকে ছিদ্রযুক্ত টেবিলের উপর রাখা হয় এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া হয়। চিংড়ি ধোয়ার কাজে প্রধানত গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য চিংড়ির পরিষ্কার বা ধোয়ার কাজটি যাতে দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

চিংড়ি বাছাই ও ওজন করা: পরিষ্কার পানিতে চিংড়ি ধোয়ার পর গ্রেড অনুযায়ী চিংড়ি বাছাই ও ওজন করা হয়। চিংড়ি বাছাই-এর ক্ষেত্রে চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ রয়েছে কী না তা পরীক্ষা করে নেয়া হয়। চিংড়ির গ্রেড নির্ধারণের পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো-

গ্রেড	মাথাবিহীন অবস্থায় প্রতি পাউন্ডে চিংড়ির সংখ্যা
১	১ থেকে ২০
২	২১ থেকে ৩০
৩	৩১ থেকে ৫০
৪	৫১ থেকে ৭০

উল্লেখ্য চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি চিংড়ির খোলস ভেঙে যায় বা খোলসের রঙের পরিবর্তন হয়, তাহলে বাছাই করার সময় এ ধরনের চিংড়ি বাদ দেয়া হয়, যা পিএন্ডডি নামে অভিহিত।

ঠান্ডা ঘরে সংরক্ষণ: চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য বাছাইকৃত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার পূর্বে ০ (জিরো) ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত ঘরে রাখা হয়। প্রক্রিয়াজাত কারখানায় এ ধরনের সাময়িক সংরক্ষণ ঘরকে চিল কক্ষ বলা হয়। চিংড়ি আহরণের উৎসের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের কক্ষে ৩টি প্রকোষ্ঠ থাকে-

১) স্বাদুপানির চিংড়ি সংরক্ষণ কক্ষ (গলদা চিংড়ি)
২) লোনাপানির চিংড়ি সংরক্ষণ কক্ষ (মূলত বাগদা চিংড়ি)
৩) লোনাপানির অন্যান্য চিংড়ি সংরক্ষণ কক্ষ

উল্লেখ্য, গলদা চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাদুপানির বরফ এবং লোনাপানির চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য লবণাক্ত পানির বরফ ব্যবহার করা হয়। কখনো চিংড়ি বাছাই ও ওজন নেওয়া দ্রুত সম্ভব না হলে এ ধরনের কক্ষে সংগৃহীত চিংড়ির সংরক্ষণ করা হয়।

ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে ধোয়া: চিল রুমে সাময়িক সংরক্ষিত চিংড়ি পরবর্তীতে ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে (৫ থেকে ১০ পিপিএম) ধোয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য সেন্ডো কীপ (sendo keep) পাউডার ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিন মিশ্রিত পানির মাধ্যমে চিংড়িকে বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করা হয়ে থাকে।

২০২৫
বাছাইকৃত চিংড়ি পুনঃপরীক্ষা: চিংড়িকে ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে জীবাণুমুক্ত করার পর পুনরায় চিংড়িকে গ্রেড অনুসারে ওজন ও বাছাই করা হয়। এ সময় চিংড়ির উদরাংশের পাতলা পর্দা ও শ্লেষ্মা ভালভাবে

পরিষ্কার করা হয় এবং নির্দিষ্ট ওজন অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ আলাদাভাবে বরফ পানিতে ধোয়ার জন্য ছিদ্রযুক্ত টেবিলে রাখা হয়। বরফ পানিতে উত্তমরূপে ধোয়ার পর ড্রেসিং টেবিলে সাজানো হয়।

চিংড়ি ড্রেসিং ও হিমায়িতকরণ পদ্ধতি: চিংড়ি ড্রেসিং করার ক্ষেত্রে ৩০ সেমি. × ২০ সেমি. মাপের টিনের ট্রেতে ৭০ সেমি. × ৭৫ সেমি. মাপের পলিথিন পেপার বিছানো হয়। অতঃপর বরফ ধোয়া চিংড়িগুলো লম্বালম্বিভাবে দু'টি সারিতে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে দু'টি সারির চিংড়ির লেজগুলো পরস্পর মুখোমুখি থাকে। পরবর্তী ধাপে ট্রে সমেত চিংড়িগুলো ৫ প্রকোষ্ট বা ৩ প্রকোষ্ঠ ট্রেতে রাখা হয় এবং পুনরায় বরফ মিশ্রিত পানি চিংড়ির উপর দেয়া হয়। ট্রেগুলো বরফের পানি দিয়ে পূর্ণ হলে পলিথিন পেপার ভাঁজ করে চিংড়ির প্যাকিং ব্লক তৈরি করা হয় এবং এয়ারব্লাস্ট ফ্রিজারের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়। ফ্রিজারে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ প্রকোষ্ঠ লম্বা ট্রে ব্যবহার করা হয়। এয়ারব্লাষ্ট ফ্রিজারে সাধারণত লম্বা ট্রের পরিবর্তে ছোট ট্রে ব্যবহার করা হয়। ফ্রিজারের চিংড়ি হিমায়িতকরণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাইনাস ৩৭ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এ রাখা হয়। এভাবে হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়া ১২ থেকে ১৩ ঘন্টা চলমান থাকে।

গ. বাক্সে প্যাক করা

প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি হিমায়িত করার পর বর্গাকৃতির চিংড়ির ব্লকগুলো দ্রুত পলিথিন ব্যাগে ভরে সিল করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে পলিথিন ব্যাগগুলো মাস্টার কার্টুনে ঢোকানো হয়। মাস্টার কার্টুনে ২০ থেকে ৫০ কেজির অধিক চিংড়ির ব্লক করা হয় না এবং কার্টুনগুলো সিনথেটিক গজ দিয়ে প্যাক করা হয়। পরবর্তী ধাপে কার্টুনের উপর চিংড়ির নাম, ওজন, গ্রেড প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়।

ঘ. হিমাগারে সংরক্ষণ করা

পরবর্তী ধাপে মাস্টার কার্টুনগুলো মাইনাস ২০ ডিগ্রি সে.-এর নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে এ অবস্থায় চিংড়ি বহুদিন সংরক্ষণ করা হয়।

৪.৩.৩ বাগদা চিংড়ি প্যাকিং ও পরিবহণ

আদিকাল থেকেই মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পরিবহণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কাঠের বাক্স, চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ, মাটির পাত্র ও বান্ডিল তৈরির জন্য রশি ব্যবহার করা হয়। প্যাকিং করার উদ্দেশ্য হলো যথাযথ সংরক্ষন, সুষ্ঠ পরিবহণ ও হ্যান্ডলিং-কে সহজতর করা ও সর্বোপরি পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। মৎস্য পণ্য পরিবহণ করার জন্য বর্তমানে ধাতুর তৈরি পাত্রের সাথে সাথে গ্লাস, কাগজ ও প্লাষ্টিক দ্বারা তৈরি পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্যাকিং প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ-

ক) প্যাকিং প্রযুক্তি এমন হবে যাতে চর্বির জারণ বন্ধ হয়।
খ) হিমায়িত মৎস্য পণ্য পানিমুক্ত করা বন্ধ করবে যাতে ফ্রোজেন অবস্থায় গঠন ঠিক থাকে।
গ) ব্যাক্টেরিয়া জনিত ও রাসায়নিক পচন বন্ধ করবে।
ঘ) চিংড়ি থেকে গন্ধ বের হওয়া বন্ধ করবে।

তাজা চিংড়ি প্যাকিং: তাজা চিংড়ি সাধারণত প্লাস্টিক বাক্স বা খাদযুক্ত বাক্সে প্যাকিং করা হয়। প্লাস্টিক বাক্স অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ প্লাস্টিক বাক্স হালকা, শক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত। চিংড়ি বাক্স নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া উচিত-

ক) বাক্সের আকার এমন হবে যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ চিংড়ি রাখা যায়।
খ) চিংড়িতে পুর্ণ বাক্স যাতে খুব সহজেই পরিবহণ করা যায়।
গ) বাক্স ব্যবহারের পর সহজেই পরিষ্কার করা যায়।
ঘ) চিংড়ি থেতলে যাওয়া, পচন, পরিবেশ দূষণ ও ছোটখাটো চুরি থেকে রক্ষা পাবে।
ঙ) বাক্সের আকৃতি এমন হবে যাতে বাক্সের ভিতরের চিংড়ির পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যায়।
চ) চিংড়ি সহজেই বিক্রয় কেন্দ্রে প্রদর্শন করা যায়।
চ) যদি বরফ ব্যবহৃত হয় তবে বরফ গলিত পানি বের হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।
ছ) সর্বোপরি বাক্স তৈরির উপকরণ সহজপ্রাপ্য ও কম দামী হতে হবে।

পাইকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্যাকিং: এক্ষেত্রে তাজা মাছ ও ফ্রোজেন চিংড়ি প্যাকিং করা হয়। সাধারণত রেসিন করা কাগজের মন্ডের বাক্স ব্যবহৃত হয়। তবে ফাইবার বোর্ড বাক্স ও করুগেটেড (corrugated) বোর্ড কার্টুন বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলোর উপর পলিথিনে আবৃত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক পূর্ণতার জন্য পলিস্টাইরিন লাইনিং ব্যবহৃত হয়।

ব্লক ফ্রোজেন প্যাকিং: এ পদ্ধতিতে চিংড়ি (খোলস ছাড়ানো) ফাইবার বোর্ড কার্টুন দিয়ে প্যাকেট করা হয়। সমস্ত প্যাকেটটি প্লেট ফ্রোজেন করা হয়। প্যাকেট শক্ত হওয়াতে পণ্যকে রক্ষা করে এবং শক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্লক ফ্রোজেন প্যাক খুব সহজেই স্টোর ও পরিবহণ করা যায়। এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো প্যাকেটের একটা চিংড়ি বের করতে হলে সমস্ত বরফ গলাতে হয়।

আইকিউএফ (Individual Quick Freezing- IQF): প্যাকেট করা বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রোজেন, গ্লেজড ও পলিথিন দ্বারা আবৃত বাক্সে ভর্তি। এ পদ্ধতিটি খুব উপযোগী কারণ খুব সহজেই খুচরা বিক্রির জন্য নতুনভাবে প্যাকেট করা যায়। সরবরাহকারীদের নিকটও খুব উপযোগী কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা যায়। আইকিউএফ পদ্ধতিতে খোলস ছাড়ানো চিংড়ি ও মাছ প্যাকেট করা হয়।

লেয়ারড প্যাক: পলিকোটেড ফাইবার বোর্ড বাক্স দ্বারা প্যাক করা হয়। ফিলেটগুলো পলিথিন লেয়ার দ্বারা পৃথক করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ফিলেটগুলো আলাদা করা যায়। লেয়ারড প্যাক, আইকিউএফ প্যাকের চেয়ে গাদাগাদি করে রাখা, গুদামজাত করা ও পরিবহণ করা সহজ।

স্যাটার প্যাকিং: সাধারণত হোটেল ও রেস্তোরায় মৎস্যজাত পণ্যের এই প্যাকেটগুলো ব্যবহৃত হয়, কারণ সমস্ত প্যাক থেকে ডিফ্রোস্টিং ছাড়া ফিলেটগুলো আলাদা করা যায়।

সারণি: সচারচর ব্যবহৃত প্যাকিং পাত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পাত্র	শক্তি	শুরুতে ব্যয়	ওজন	স্থায়িত্বশীলতা	পুনরায় ব্যবহার	স্বাস্থ্যসম্মত
বেতের পাত্র	শক্ত	সস্তা	খুব বেশি	ভালো	হাঁ	কম
ঝুঁড়ি	মোটামুটি শক্ত	সস্তা	হালকা/ মধ্যম	সুন্দর	না	কম
কার্টুন	দুর্বল	সস্তা	হালকা	কম	না	ভালো
ধাতুর তৈরি প্যান	শক্ত	ব্যয়বহুল	মধ্যম	ভালো	হাঁ	ভালো
প্লাস্টিকের তৈরি প্যান	মোটামুটি	মোটামুটি	মধ্যম	ভালো	না	ভালো
গ্যাস বাক্স	শক্ত	ব্যয়বহুল	খুব ভালো	ভালো	হাঁ	ভালো
পাটের ব্যাগ	মোটামুটি	মোটামুটি	হালকা	ভালো	হাঁ	কম
কাগজ	দুর্বল	খুব সস্তা	খুব হালকা	কম	না	কম
পাতা	দুর্বল	খুব সস্তা	খুব হালকা	কম	না	কম

বাগদা চিংড়ি পরিবহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-

ক) পরিবহণের সময় ও দূরত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় বরফ ব্যবহার করতে হবে, যাতে গন্তব্য স্থানে পৌছার পরও চিংড়ির গায়ে বরফ থাকে।

খ) হোগলার চাটাই, ছালার চটে মুড়িয়ে বাঁশ নির্মিত ঝুড়িতে ও বরফবিহীন অবস্থায় চিংড়ি পরিবহণ পরিহার করা।

গ) ইনসুলেটেড/ তাপ নিরোধক পাত্র বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে বরফ মিশ্রিত করে চিংড়ি পরিবহণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) পরিবহণকালে পাত্র বা বাক্সে চিংড়ি রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে উপরের চিংড়ির চাপে বা বাক্সের ডালা লাগাবার সময় অধিক চাপ না পড়ে। অধিক চাপে নিচের চিংড়ি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কেননা চিংড়ির মাংসপেশী অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর চাইতে নরম।

ঙ) ডিপো থেকে পরিবহণের ভাড়া সাশ্রয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে ট্রাকে বরফ সহকারে চাটাই বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে যতদ্রুত সম্ভব চিংড়ি কারখানায় স্থানান্তর করা।

চ) অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের বরফ ব্যবহার করে খোলা ট্রাকে স্তুপাকারে অধিক পরিমাণ চিংড়ি পরিবহণ না করা। পরিবহণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ছ) চিংড়ি বোঝাই ট্রাকে চাটাই বা ত্রিপলের উপর ট্রাকের সাহায্যকারীরা অবাধে চলাফেরা করার ফলে চিংড়ি থেতলে যায়, নরম হয়, সতেজতা হারায় এবং পচনকারী অণুজীব দ্বারা সহজেই সংক্রমিত হয়। চাটাই বা ত্রিপলের উপর দিয়ে ট্রাকের সাহায্যকারীরা অবাধে চলাফেরা করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

৪.৪ চিংড়ি বিপণন

আমাদের দেশে চিংড়ি সম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে এখনো কোনো ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি বলেই প্রতীয়মান হয়। মূলত চিংড়ি উৎপাদনকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা, সম্পদ সংরক্ষণ সুযোগ-সুবিধা ও মধ্য-সুবিধাভোগীদের (ফড়িয়া, আড়তদার, বেপারী) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। খুব কম পরিমাণ চিংড়িই চিংড়ি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রেতার হাতে পৌঁছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্য-সুবিধাভোগীদের একটা ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে তা বাজারে আসে। আমাদের দেশে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়া ধারাবাহিক পর্যায় বা ধাপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক. চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারী বা জেলে সম্প্রদায়

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় সাধারণত দু'টি উৎস থেকে সরাসরি বাজারে চিংড়ি আসে, যেমন- খামারে উৎপাদিত চিংড়ি (পুকুর, স্বাদুপানির জলাশয় ও উপকূলবর্তী চিংড়ি খামার) এবং প্রাকৃতিক জলজসম্পদ থেকে আহরিত চিংড়ি (নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র উপকূলীয় জলাশয়)। চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারী বা জেলে সম্প্রদায় অনেক সময় সরাসরিভাবে চিংড়ি বিপণন করে থাকে।

খ. মধ্যস্বত্বভোগী (দালাল, ফড়িয়া, নিকারী)

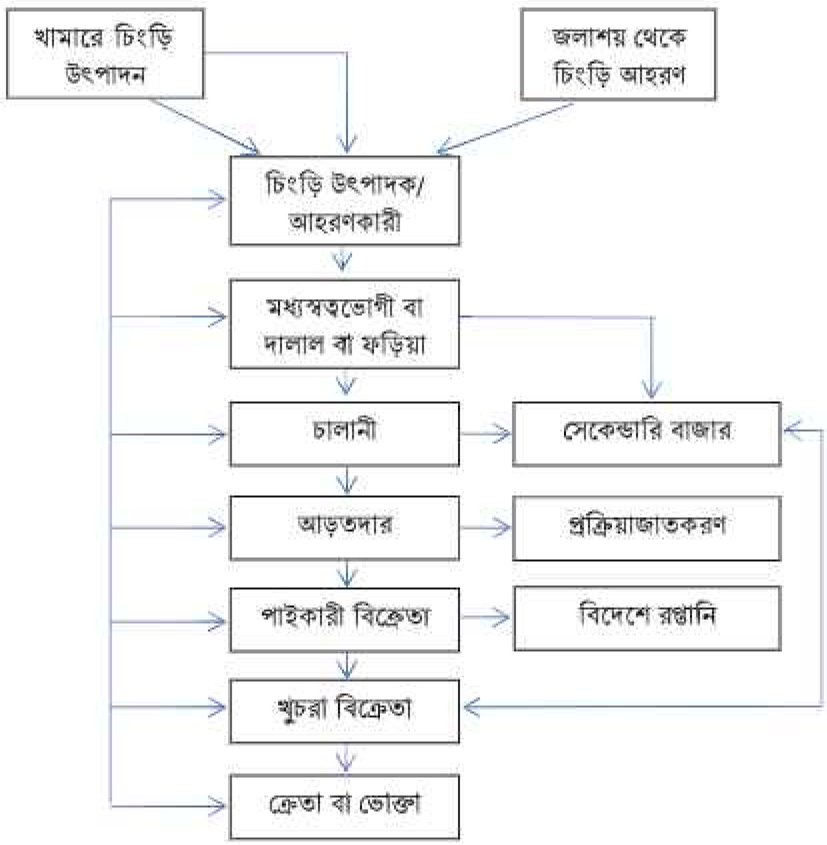
আহরিত চিংড়ি ও মাছ কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি বাজারে বিক্রয় হলেও উৎপাদক বা আহরণকারী কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই বললেই চলে। অধিকাংশ আহরিত চিংড়ি দালাল বা নিকারীদের মাধ্যমে বড় ব্যবসায়ী বা আড়তদারের নিকট এসে পৌঁছে। কখনো কখনো দালালদের মাধ্যমে সরাসরি খুচরা বিক্রয়কারীর নিকট পৌঁছে থাকে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে নিকারী মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে চিংড়ি আহরণকারীদের (জেলে) অগ্রিম ধার দিয়ে থাকে। ফলে আহরণকারীগণ চুক্তিভিত্তিক ধার্যকৃত মূল্যে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত চিংড়ি উৎপাদক বা আহরণকারীরা যেমন- আহরিত চিংড়ির প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি পরোক্ষভাবে ক্রেতারাও অধিক মূল্যে চিংড়ি ক্রয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীরাই উৎপাদিত চিংড়ি বিপণনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হয়ে থাকে।

গ. চালানী

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় এরা হল প্রকৃত মৎস্য ব্যবসায়ী বা মহাজন। এরা নিকারি বা দালালদের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন এলাকা থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করে মহাজন বা শহরের বড় ব্যবসায়ীদের নিকট পৌঁছে দিয়ে থাকেন। দালাল বা নিকারীরা এদের কাছ থেকে মূলধন ও সংরক্ষণ উপকরণ পেয়ে থাকেন।

ঘ. আড়তদার

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় চালানী, দালাল বা চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারীদের মাধ্যমে আহরিত চিংড়ি আড়তদারের কাছে পৌঁছায়। আড়ত বলতে মূলত আধুনিক সুযোগা-সুবিধা সম্বলিত চিংড়ি সংরক্ষণ ও বিক্রয় কেন্দ্রকে বুঝানো হয়। এখান থেকেই মাছ বা চিংড়ি উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয়। বিক্রীত টাকার ওপর আড়তদার নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকেন। কমিশনের পরিমাণ এলাকাভেদে ও আড়তের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। মূলত আড়তদার পাইকারি বিক্রেতার নিকট চিংড়ি বিক্রয় করে থাকেন।



চিত্র ৫.৭: বাংলাদেশের সাধারণ চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়া

ঙ. পাইকারী বিক্রেতা

পাইকারী বিক্রেতা দর কষাকষির মাধ্যমে খুচরা বিক্রেতার কাছে মাছ বিক্রয় করে। খুচরা বিক্রেতা ভোক্তা বা ক্রেতার কাছে মাছ বা চিংড়ি পৌঁছে দেন। এ ক্ষেত্রেও দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় রপ্তানি একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশও ইতোমধ্যে বিশ্ব বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ উন্মুক্ত বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী চিংড়ির গুণগতমান উন্নতকরণের লক্ষ্যে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যক্ষম করতে হবে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিংড়ি বিপণন নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৫ চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

চিংড়ির বিপণন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। চিংড়ি রপ্তানিযোগ্য পণ্য হওয়ায় মুলত চিংড়ি চাষ সমৃদ্ধ উপকুলবর্তী এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট বা শিল্প গড়ে উঠেছে। চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো-

ক. চিংড়ি উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা

বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে বাগদা ও গলদা চিংড়িই প্রধান। উপকুলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের খামার বৃদ্ধি পেলেও হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন খুবই কম। ফলে চিংড়ি চাষের অভীষ্ট এলাকায় এখনও চিংড়ি দ্রুত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে উঠেনি। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে খামার স্থাপনের কারণেও চিংড়ি উৎপাদনকারীরা উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করতে পারে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, যা ভবিষ্যতে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের অন্তরায় স্বরুপ।

খ. পরিবহণ সমস্যা

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘেরে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হলেও আধুনিক চিংড়ি খামারের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং চিংড়ি উৎপাদন এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভাল নয়। ফলে ক্রেতা বা ভোক্তাদের অবস্থান অনেকটা এলাকাভিত্তিক হিসেবেই গড়ে উঠেছে। অপরদিকে চিংড়ি দ্রুত পচনশীল পণ্য হওয়া সত্ত্বেও বিপণন প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করার জন্য পর্যাপ্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কোন পরিবহণ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি।

গ. দীর্ঘ বিপণণ প্রক্রিয়াগত সমস্যা

আমাদের দেশে মৎস্যসম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে ফড়িয়া, বেপারী, দালাল ও আড়তদারগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের মাধ্যমেই তা পুনরায় পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তাদের হাতে পৌছে। ফলে পচনশীল চিংড়ি সম্পদ দীর্ঘসময় ধরে হাত বদলের কারণে বিভিন্ন উপায়ে পণ্যের গুণগতমান বিনষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি বিপণন প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ঘ. প্রক্রিয়াজাতকরণ সমস্যা

চিংড়ি সম্পদের সুষ্ঠ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি বিপণনের ক্ষেত্রে শুধু বরফ ব্যবহার করে হিমায়িতকরণের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পৌছানো হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা গেছে, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহকৃত চিংড়ির প্রায় ২৫ শতাংশেরও অধিক চিংড়ি বিবর্ণ, অপরিষ্কার এবং কালো দাগযুক্ত। সংশ্লিষ্ট চিংড়ি সরবরাহকারীদের অনভিজ্ঞতা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণেই চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয় এবং বাজারমূল্য কম হয়ে থাকে। ফলে একদিকে সরবরাহকারীরা যেমন ব্যবসায়িক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপরদিকে দেশও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সাধারণত আমাদের দেশে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত উপকুলীয় অঞ্চলের ঘের এবং মুক্ত জলাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত চিংড়ি আহরণ করা হয়। এ সময়ে আমাদের দেশের আবহাওয়া উষ্ণ থাকার কারণে এবং চিংড়ি দ্রুত প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ না করার ফলে অধিকাংশ চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। অনুরুপভাবে ট্রলারে আহরিত চিংড়ি অনেক সময় অসচেতনতার কারণে দিনের সুর্যালোকে উত্তপ্ত ডেকে ফেলে রাখা হয়। ফলে চিংড়ির দেহে কালো দাগ দেখা দেয়, যা চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায়। চিংড়ি বিপণনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও চিংড়ি হিমায়িতকরণ ও চিংড়ি উৎপাদন এলাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগত সমস্যা, প্রযুক্তিগত সমস্যা, বিশ্ববাজারে চিংড়ির অস্থিতিশীল মূল্য, বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় অর্থসংস্থানগত সমস্যা, চিংড়ির সংরক্ষণের উপযুক্ত স্থানগত সমস্যা প্রভৃতি অন্যতম। দক্ষ বিপণন প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.৬ বাগদা চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণ

মাছ বা চিংড়ি মৃত্যুর পর যে প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন- স্বাভাবিক গঠন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির অবনতি ঘটে তাকে পচন ক্রিয়া বলে। পচন সংঘটিত হয় মূলত অণুজীবের কর্মতৎপরতা ও দেহ অভ্যন্তরস্থ জৈব পদার্থে বিদ্যমান এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে। মাছ বা চিংড়ি মৃত্যুর পর তার পেশীতে পর্যায়ক্রমে

সংঘটিত জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে দেহ শক্ত হয়ে যাওয়ার পরপরই পচন শুরু হয়। চিংড়ি আহরণ করার পর এবং প্রক্রিয়াজাত করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে নিম্নলিখিত কারণে চিংড়ির পচন হয়ে থাকে-

ক. এনজাইমের বিক্রিয়া ঘটিত পচন: জীবিত অবস্থায় যেসব এনজাইম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে সেগুলো মাছ/চিংড়ির মৃত্যুর পর দেহ অভ্যন্তরস্থ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বির ব্যাপক ভাঙ্গন ঘটায়, ফলে দেহে পচন শুরু হয়। এই পচনকে স্বয়ংক্রিয় পচনও বলা হয়। এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে পেশী দুর্বল হয়ে যায়, ফলে ব্যাক্টেরিয়ার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে পেশীর প্রোটিন ভেঙ্গে বিভিন্ন এসিড ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থে রুপান্তরিত হয়, যা থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থ উৎপন্ন হয়।

খ. র‍্যানসিডিটি: চর্বিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে এ ধরনের রাসায়নিক পচন হয়ে থাকে। মাছ/চিংড়ির চর্বি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড দ্বারা গঠিত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এগুলো জারিত হয়। এর ফলে মাছ বিবর্ণ হয়ে যায় এবং মাছ বা চিংড়ির স্বাদ বা গন্ধ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। বিশুদ্ধ লবণ ব্যবহার করে চর্বিযুক্ত মাছ বা চিংড়ির র‍্যানসিডিটি কমানো যায়।

গ. ব্যাক্টেরিয়ার কর্মতৎপরতা ঘটিত পচন: তাজা মাছের দেহে কোন ব্যাক্টেরিয়া না থাকলেও মাছ বা চিংড়ি ফুলকা, অন্ত্র ও ত্বকীয় শ্লেষ্মায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাক্টেরিয়া থাকে। এই ব্যাক্টেরিয়া মাছ বা চিংড়ির পচনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জলীয় পরিবেশ ব্যাক্টেরিয়ার ক্রমবিকাশের জন্য একটি উত্তম মাধ্যম। ফলে মাছ বা চিংড়ি আহরণের সময়েই ব্যাক্টেরিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতিগতভাবেই মাছ বা চিংড়ি জীবিত অবস্থায় ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে দেহে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বজায় রাখে, যা মৃত্যুর পর আর কার্যকর থাকে না। ফলে দেহ অভ্যন্তরস্থ এনজাইমের স্বয়ংক্রিয় বিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পেশী ব্যাক্টেরিয়ার প্রবেশ উপযোগী হয় এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। মাছ বা চিংড়ির দেহস্থিত ব্যাক্টেরিয়া ছাড়াও অবতরণ কেন্দ্র ও আহরণোত্তর পরিচর্যাকালীন সময়ে প্রচুর ব্যাক্টেরিয়া মাছ বা চিংড়ির দেহে প্রবেশ করে। মাছ বা চিংড়ির দেহে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলো হলো- এ্যারোমোব্যাক্টর, সিউডোমোনাস, মাইক্রোকক্কাস ইত্যাদি।

পচন রোধের উপায়সমূহ

১. অণুজীব কর্তৃক সৃষ্ট পচনকে বাধা দেয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

- ক) অণুজীবকে চিংড়ি বা খাদ্যে ঢুকাতে না দেওয়া বা দুরে রাখা।
- খ) অণুজীবকে অপসারণ করা।
- গ) অণুজীবের বৃদ্ধি বা কার্যাবলীতে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যেমন- খুব ঠান্ডা করে বা শুষ্ক করে এনেরোবিক অবস্থা সৃষ্টি করে (অক্সিজেনের অভাব ঘটিয়ে), রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ইত্যাদি।

২০২৫

ঘ) অণুজীবসমূহকে ধ্বংস করার মাধ্যমে।

২. চিংড়ির স্বপচন (self decomposition) বন্ধকরণের লক্ষ্যে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) ড্রেসিং-এর মাধ্যমে পরিপাকীয় এনজাইমের অপসারণ।

খ) সত্যিকারের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বাধা দেয়া বা বিলম্ব করা।

গ) চিংড়ির এনজাইমকে ধ্বংস করে বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে।

ঘ) পোকা মাকড়, অন্যান্য প্রাণী, যান্ত্রিক কারণ ইত্যাদির ফলে খাদ্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ

তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) **শীতলীকরণ:** এ প্রক্রিয়ায় মাছ বা চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা ০(শুন্য) ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি আনা হয় এবং সপ্তাহখানেক পর্যন্ত মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান ভাল অবস্থায় থাকে।

খ) **হিমায়িতকরণ:** এ প্রক্রিয়ায় মাছ বা চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি রাখা হয় এবং মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান ৬ থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে।

ক. শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ

চিলিং বা শীতলীকরণ এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়ন বিন্দুর প্রায় কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। তবে কখনই এর নিচে নয়। হিমায়ন বিন্দু বিভিন্ন প্রজাতিতে ০.৬ থেকে ২ ডিগ্রি সে. এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। তবে সচরাচর একে ১ ডিগ্রি সে. ধরা হয়।

অতি শীতলীকরণ (Supper Chilling): চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়ন বিন্দুর ঠিক নিচের তাপমাত্রায় নিয়ে আসাকে অতি শীতলীকরণ বুঝায়। এখানে চিংড়ির মাংস হিমায়িত হতে শুরু করে।

চিলিং এর উদ্দেশ্য

চিলিং সাধারণত চিংড়ি বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কারণ এটি-

ক) অনুজীবের বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে দেয়।

খ) চিংড়ির মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যাবলীকে হ্রাস করে।

গ) রাসায়নিক কর্মকান্ডের ফলে চিংড়ির পচনকে রোধ করে।

চিলিং বা শীতলীকরণ পদ্ধতি

চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে শীতলীকরণ সবচেয়ে পরিচিত সংরক্ষণ পদ্ধতি। সাধারণত চিংড়িকে স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে শীতলীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে চিলিং করা হয়। যথা-

১. বরফের সাহায্যে শীতলীকরণ (Chilling with Ice)

বরফ একটি আদর্শ শীতলীকরণ মাধ্যম। একটি নির্দিষ্ট ওজনের বা আয়তনের বরফের ঠান্ডাকরণ ক্ষমতা খুব বেশি নিরাপদ, তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং চিংড়ির ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে চিংড়িকে দ্রুত শীতল করে। কার্যকর শীতলীকরণের জন্য বরফকে অবশ্যই গলতে দিতে হবে। অধিকন্তু গলিত বরফ চিংড়িকে আর্দ্র ও চকচকে রাখে।

আমরা জানি, পানি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ সরিয়ে নিলে পানি বরফে পরিণত হয় এবং একই পরিমাণ তাপ যোগ করা হলে বরফ পুনরায় পানিতে পরিণত হয়। কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় আসতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয় তাকে সুপ্ত তাপ বলে। ১ কেজি বরফ গলতে ৮০ কিলোক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। তাই ৮০ কিলোক্যালরি তাপমাত্রাকে বরফ গলনের সুপ্ততাপ বলে। বরফ গলতে বেশি তাপের প্রয়োজন হয় বলে এটি ভালো ঠান্ডাকরণ বাহক হিসেবে কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য, ১ কেজি পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপকে ১ কিলোক্যালরি বলা হয়।

পানির আপেক্ষিক তাপ ১ এবং অন্যান্য পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ১ অপেক্ষা কম। নিম্নে কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ উল্লেখ করা হলো।

পদার্থ	আপেক্ষিক তাপ
বরফ	প্রায় ০.৫
ওয়েট ফিস (ভিজা মাছ)	প্রায় ০.৯৬ (সাধারণত ১ ধরা হয়)
হিমায়িত মাছ	প্রায় ০.৪
অধিকাংশ ধাতব পদার্থ	প্রায় ০.১



চিত্র ৫.৮: বরফের সাহায্যে চিংড়ি শীতলীকরণ

বরফ কিভাবে চিংড়িকে ঠান্ডা করে: শীতলীকরণ করার জন্য যখন বরফকে চিংড়ির সংস্পর্শে রাখা হয়, তখন গরম বা উষ্ণ চিংড়ি থেকে তাপ বরফে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে চিংড়ির তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং বরফ গলতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিংড়িকে শীতল করার জন্য কি পরিমাণ তাপ অপসারণ করতে হবে এবং কি পরিমাণ বরফ প্রয়োজন তা সহজেই হিসাব করা যায়।

কোন পদার্থ ঠান্ডা হতে কি পরিমাণ তাপ বর্জন করে তা আপেক্ষিক তাপ ব্যবহার করে বের করা যায়। যেমন- বর্জিত তাপ= বস্তুর ওজন × তাপমাত্রার পার্থক্য × আপেক্ষিক তাপ।

উদাহরণ: ১০ কেজি মাছ যার তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সে. এবং মাছের আপেক্ষিক তাপ ১। এখন ১০ কেজি মাছকে ২৫ ডিগ্রি সে. থেকে ০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে বর্জিত তাপ হলো-
=১০ × ২৫ × ১ = ২৫০ কিলোক্যালরি, কিন্তু ১ কেজি বরফ গলতে ৮০ কিলোক্যালরি তাপ গ্রহণ করে। সুতরাং ১০ কেজি মাছ ঠান্ডা হতে = ২৫০÷৮০= ৩.১২ কেজি বরফ প্রয়োজন হবে।

বরফের প্রকারভেদ

ক) ব্লক আইস (Block ice): এটি মৎস্য শিল্পে ব্যবহৃত বরফের মধ্যে অন্যতম এবং বহুল পরিচিত। আমাদের দেশে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুসারে একখন্ড বরফের ওজন ১২-১৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে বাজারের ওপর নির্ভর করে এর আকৃতি দেয়া হয়। চিংড়ি শীতলীকরণের জন্য ব্লক আইসকে গুঁড়ো করে ব্যবহার করা হয়।

খ) ফ্লেক আইস (Flake ice): এটি তুলার ন্যায় নরম। এটি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের গুঁড়ো, যা দেখতে পাউডারের ন্যায়।

গ) টিউব আইস (Tube ice): এ ধরনের বরফ একটা উলম্ব নলের ভিতরের গাত্রে তৈরি করা হয়, যা ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির হয়ে থাকে। এর পুরুত্ব প্রায় ১০-১২ মিটার ও আকার ৫০×৫০ বর্গ মিমি.। নল থেকে বরফ বের করার পর একে বরফ কাটা নলের সাহায্যে সুবিধামত খণ্ডে (সাধারণত ৫০ মিমি) কাটা হয়।

ঘ) প্লেট আইস (Plate ice): এটি দেখতে প্লেটের ন্যায়। একটি উলম্ব প্লেটের এক মুখে এ ধরনের বরফ তৈরি হয় এবং অপর মুখে পানি প্রবাহিত করে একে প্লেট থেকে বের করে আনা হয়। এই বরফের সর্বানুকুল পুরুত্ব হলো ১০-১৫ মিমি। তবে বরফ খণ্ডের আকার পরিবর্তনশীল।

২. শীতল পানিতে চিংড়ি নিমজ্জনের মাধ্যমে

এটি করা হয় মূলত দু'ভাবে- ক) রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানি ও খ) শীতল সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করে।

ক. রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানি (Refrigerated Sea Water- RSW)

এক্ষেত্রে সমুদ্রের পানিকে ঠান্ডা করে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের পানিতে শতকরা ৩.৫ ভাগ লবণ থাকে। যদি সমুদ্রের পানিকে রেফ্রিজারেটেড করা হয় তাহলে সহজে তাপমাত্রা কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাইনাস ২ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ১০ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানির সুবিধা-

১) খুব দ্রুত ঠান্ডা হয় কারণ এর ক্ষেত্রফল বেশি হয়।
২) চিংড়ির একটির উপর অন্যটিকে রেখে জড়তা কমিয়ে দেয়।
৩) নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বাধা সম্ভব।
৪) অল্প সময়ে, কম শ্রমে অধিক পরিমাণে চিংড়িকে দ্রুত পরিচর্যা করা যায়।

রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানির অসুবিধা-

১) চিংড়ির দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে লবণ প্রবেশ করে, কারণ সমুদ্রের পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকে। ফলে প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে অসুবিধা হয়।
২) চিংড়ির ওজন বেড়ে যায়, কারণ পানি ও লবণ দেহে প্রবেশ করে।
৩) প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায়।
৪) অল্প সময়েই অ্যানারোবিক হ্যালোফিলিক ব্যাক্টেরিয়া চিংড়ি পচাতে শুরু করে।

খ. শীতল সামুদ্রিক পানি (Chilled Sea Water- CSW)

সমুদ্রের পানির সাথে কিছু পরিমাণ বরফ মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কিছু ঠান্ডা আসে রেফ্রিজারেটর থেকে এবং কিছু আসে বরফ থেকে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত সাধারণত ৩:১ অথবা ৪:১ হয়ে থাকে। শীতল সামুদ্রিক পানি পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত ঠান্ডা করার জন্য কী পরিমাণ বরফ প্রয়োজন তা সহজে নির্ণয় করা যায়। নিচে এ সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ দেওয়া হল –

ধরা যাক, ৮ টন বা ৮ হাজার কেজি চিংড়িকে ২৪ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ১ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হবে এবং চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ৪:১। চিংড়ি ও পানির মিশ্রণের ফলে তাদের একত্রে ওজন হবে ১০ টন (১০ হাজার কেজি) এবং কি পরিমাণ তাপ বর্জন করবে তা নিচের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি,

H= mst
= ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রায় পার্থক্য
= ১০০০০ × ১ ×১ {২৪-(-১)}
= ১০০০০ × ১ × (২৪+১)
=১০০০০ × ১ ×২৫
= ২৫০০০০ কিলোক্যালরি

এখানে, m= মাছের ভর
s= আপেক্ষিক তাপ (১ হলো মাছ ও পানির আপেক্ষিক তাপ)
t= তাপমাত্রায় পার্থক্য
H= বর্জিত তাপ

আমরা জানি, বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৮০ কিলোক্যালরি।
এতএব প্রয়োজনীয় বরফের ওজন = ২৫০০০০÷৮০= ৩১২৫ কেজি।
অতএব মাইনাস ১.০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় নিয়ে আসার জন্য ৩ টনের কিছু বেশি বরফ দরকার হবে।

৩. শীতলীকরণ কক্ষে চিংড়ির উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহের মাধ্যমে-

ক) সমুদ্রে বরফ দিয়ে চিংড়ি শীতলীকরণ (Chilling of Fish with Ice at Sea).

খ) স্তুপাকারে শীতলীকরণ (Bulk Chilling)

যেখানে চিংড়ি ধরা হয় এবং যে জলযানের মাধ্যমে চিংড়ি ধরা হয় তার উপর যে শীতলীকরণ করা হয় তাকে স্তুপাকারে শীতলীকরণ বলে। একটি উপযুক্ত ফিসরুম বিশিষ্ট ফিসিং ভেসেলে নিম্নরূপে চিংড়িকে মজুত করা হয়। ২০২৫

প্রথমে ফিসরুমের তলদেশ বরফ দিয়ে ১৯০ থেকে ১৯৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরভাবে আবৃত করে দিতে হয়। তবে বরফের গভীরতা বা পুরুত্ব নির্ভর করে ফিসরুমে ব্যবহৃত নিরোধক, জাহাজের দৈর্ঘ্য এবং সমুদ্রের পানির তাপমাত্রার উপর যদি ফিসরুম ধাতব পদার্থের তৈরি হয়। যদি মেঝে অন্তরিত (insulated) না হয়, তবে তলায় বরফের স্তরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়। তখন এই বরফের স্তরের উপর চিংড়ি রাখতে হবে। তারপর আবার চিংড়ির উপর বরফের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে চিংড়ির মধ্যে বরফের গুঁড়ো থাকবে। প্রতিটি চিংড়ি একে অপরের সাথে লেগে থাকলে ঠান্ডা হতে যত সময় লাগবে তার চেয়ে কম সময় লাগবে যখন প্রতিটি চিংড়ি বরফের গুঁড়ো দিয়ে পৃথক থাকে। এরপর বরফের দ্বিতীয় স্তর দেওয়া হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আগেরগুলো ভর্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গুঁড়ো বরফ ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বরফের সর্বশেষ যে স্তরটি হয় তার পুরুত্ব ৫ সেন্টিমিটার হতে হবে। প্রতি আধা মিটার পর পর বরফের সাপোর্ট দিতে হবে। চিংড়ির বাক্সে বা ফিসরুমে চিংড়ির স্তর বেশি হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে অতিরিক্ত চিংড়ির চাপে তলার চিংড়ি ফেটে যেতে পারে এবং চিংড়ির দেহের তরল পদার্থ বের হয়ে আসতে পারে। ফলে চিংড়ি ওজনে কমে যেতে পারে।

বাক্স শীতলীকরণ (Box Chilling): সমুদ্রের তীরে আসার পর বাক্সে চিলিং করা চিংড়ি স্তুপ করা চিংড়ির চেয়ে ভালো থাকে এবং ভূমিতে বা তীরে আসার পরও চিংড়ি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এক্ষেত্রে বাক্সের ডিজাইন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাক্সটি এমন আকৃতির হতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফসহ চিংড়ি ধারণ করতে পারে। এই অবস্থায় বরফ চিংড়িকে ভূমিতে আসা পর্যন্ত ঠান্ডা রাখে। আবার একইভাবে বাক্স প্রশস্ত হবে না যাতে একে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। বাক্সে এমনভাবে ড্রেনের ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে গলিত পানি গড়িয়ে বাক্সের একপাশে বা শেষ প্রান্তে এসে জমা হয়। বাক্সে চিংড়ি বোঝাই করার সময় বাক্সের তলায় প্রায় ৬ সেন্টিমিটার গভীর বরফের স্তর থাকে এবং শেষ স্তরের পুরুত্বও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। বাক্সটি বেশি বোঝাই করা উচিত নয়, যাতে করে এটি ফেটে যেতে পারে।

সতর্কতা:

১. চিংড়ির স্তরের পুরুত্ব যেন বেশি না হয়। পুরুত্ব বেশি হলে ভিতরের চিংড়িগুলো ঠান্ডা হতে সময় বেশি লাগবে।
২. স্তুপাকার শীতলীকরণের সাহায্যে অতিরিক্ত স্তর দিতে হবে।
৩. বাক্স শীতলীকরণের দৈর্ঘ্য ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি হওয়া উচিৎ নয়। এর চেয়ে বড় হলে পরিবহণে অসুবিধা হবে।
৪. শীতল পানিতে চিংড়ি নিমজ্জনের মাধ্যমে চিংড়িকে শীতল করা যায়।

শীতলীকরণের সময় চিংড়ির পরিবর্তন

ক) প্রোটিন ও ওজনে কম হওয়া: বরফ দিয়ে চিংড়ি শীতল করতে থাকলে চিংড়ির ওজন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ব্যাপকভাবে মুক্ত তরল ও ড্রিপ গঠনের (drip formation) কারণে হিমায়িত ফিলেট ও স্টেক (fillets and steaks) ওজনে কমে যায়। কারণ ড্রিপ গঠনের ফলে কিছু দ্রবণীয় প্রোটিন, লবণ ও অন্যান্য পুষ্টিকারক দ্রব্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসে।

খ) বিবর্ণতা (Discoloration): চিলিংয়ের সময় চিংড়ির উপর বরফের অতিরিক্ত চাপের কারণে চিংড়ির ক্ষতি হয়। দেহ থেতলে যায়, গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং বিবর্ণ হয়ে থাকে।

গ) পচনশীলতা (Rancidity): বরফ দিয়ে দীর্ঘদিন শীতলীকরণের জন্য পচা গন্ধ চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়।

ঘ) কুঞ্চিত হওয়া (Shrinkage): কুঁচকে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা যা চিংড়ির বরফ দিয়ে প্যাকেট করার সময় ঘটে থাকে। বিশেষ করে উপরের স্তরে এটা ঘটে।

খ. হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ

হিমায়িতকরণ হলো চিংড়ি সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যাতে চিংড়ি দেহের প্রাথমিক তাপমাত্রাকে কমিয়ে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এর নিচে আনা হয়, ফলে চিংড়ির কলার বেশিরভাগ পানি জমে বরফে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ৮৫ শতাংশ পানি বরফে রূপান্তরিত হয়। যদিও মাইনাস ৮ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় চিংড়িকে হিমায়িতকরণ করা হয় তথাপিও এনজাইমেটিক কর্মতৎপরতা মাইনাস ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। তাই চিংড়ির গুণগতমান ভাল রাখার জন্য মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় চিংড়িকে ফ্রোজেন করা হয়। হিমায়িতকরণের আধুনিক পদ্ধতিতে দ্রুত দেহের তাপমাত্রা নিচে নেমে আসে এবং চিংড়ির দেহকলার অভ্যন্তরস্থ সর্বশেষ তাপমাত্রা হয় মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে.।

হিমায়িতকরণের উদ্দেশ্য: হিমায়িতকরণের মাধ্যমে কোন একটি দ্রব্যের গুণগত মান অপরিবর্তিত রাখা হয়। নিম্নলিখিত কারণে চিংড়ির ফ্রিজিং বা হিমায়িত করা হয়ে থাকে। যথা-

১) অণুজীব দ্বারা খাদ্য বস্তুর পচনকে রোধ করে বা বাধা দেয়।
২) এনজাইমের কার্যাবলীকে রোধ করে বা বাধা দেয়।
৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করে বা বাধা দেয়।

আংশিক হিমায়িতকরণ (Partial freezing): আংশিক হিমায়িতকরণ হলো চিলিং এবং হিমায়িতকরণ তাপমাত্রার মধ্যবর্তী একটি তাপমাত্রা অর্থাৎ যখন চিংড়ির দেহের তাপমাত্রাকে কমিয়ে মাইনাস ৩ ডিগ্রি সে. বা মাইনাস ৪ ডিগ্রি সে. এ আনা হয়, তখন তাকে আংশিক হিমায়িতকরণ বলে।

ফ্রোজেন (Frozen): ফ্রোজেন হলো তাপমাত্রাকে কমিয়ে কমপক্ষে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ১০ ডিগ্রি সে. এ নিয়ে আসা।

ফ্রোজেন পণ্য (Frozen product): যখন কোন বস্তুর তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ১০ ডিগ্রি সে. এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়, তখন সেই বস্তুকে ফ্রোজেন পণ্য বলে ।

চিলিং স্টোরেজ (Chilling storage): চিংড়িকে হিমায়িতকরণ তাপমাত্রার উপরে রেখে গুদামজাত করাকে চিংড়ির চিলিং স্টোরেজ বলে। চিলিং স্টোরেজের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কারণ এটি স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে খুবই ফলপ্রসু।

সারণি: চিলিং ও ফ্রিজিং এর মধ্যে পার্থক্য

ক্রমিক	চিলিং	ফ্রিজিং
০১.	তাপমাত্রা কমিয়ে ফ্রিজিং পয়েন্টের নিকট নিয়ে আসা	তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সে. বা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এ নিয়ে আসা
০২.	দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয় না	দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয়
০৩.	এটি স্বল্পকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি	এটি দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি
০৪.	মাছ ধরার যান্ত্রিক যানে এর সুযোগ- সুবিধা থাকে	ট্রলারে ও মাদারশীপে সাধারণত এ সুযোগ সুবিধা থাকে
০৫.	চিলিং সাধারণত বরফের মাধ্যমে করা হয়	ফ্রিজিং সরাসরি ফ্রিজারের মাধ্যমে করা হয়

হিমায়িতকরণের শ্রেণিবিন্যাস

হিমায়িতকরণ মূলত দু' প্রকার যথা-

ক) ধীরগতি হিমায়িতকরণ (slow freezing), এবং
খ) দ্রুত হিমায়িতকরণ (quick freezing)

ক) ধীরগতি হিমায়িতকরণ (slow freezing)

এ পদ্ধতিতে ধীরে ধারে চিংড়ির দেহ থেকে তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়িতকরণ তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয়। সাধারণত তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সে. বা তার নিচে রাখা হয়। তাই এই তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সে. বা নিচে রাখা হয়। হিমায়িতকরণ হতে সময় লাগে ৩ ঘন্টা থেকে ৭২ ঘন্টা।

ধীরগতি হিমায়িতকরণের সুবিধা

- মাইনাস ১ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণের জন্য খুবই অসুবিধাজনক।
- তাপমাত্রা খুব ধীরে ধীরে কমে বিধায় চিংড়ির দেহের অধিকাংশ ব্যাক্টেরিয়া মারা যায়।

ধীরগতি হিমায়িতকরণের অসুবিধা

- যেহেতু এটি ধীর প্রক্রিয়া তাই চিংড়ির দেহে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ব্যাক্টেরিয়ার কর্মতৎপরতা চলতে থাকে, ফলে কিছুটা হলেও চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হয়।
- ধীর হিমায়নের ফলে বরফের বড় কেলাস (crystal) উৎপন্ন হয় যা পেশীকে নষ্ট করে ফেলে তাই চিংড়ির বাজার দর কমে যায়।
- বেশি লবণ বেরিয়ে আসে ফলে প্রোটিন ডিনেচারেশন (denaturation) বা বিনষ্ট হয়।

খ) দ্রুত হিমায়িতকরণ (Quick freezing)

এই পদ্ধতিতে দ্রুত চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হয়। এ ক্ষেত্রে হিমায়িতকরণের তাপমাত্রা সাধারণত মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এবং হিমায়িতকরণ হতে ৩০ মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় লাগে।

দ্রুত হিমায়িতকরণের সুবিধা

- চিংড়ির শরীরের অভ্যন্তরে গঠিত বরফের কণিকাগুলো ছোট বলে দেহ কলার যান্ত্রিক ক্ষতি হয় না, আর হলেও কম হয়।
- যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় কম সময়ের মধ্যে চিংড়ির দেহ মধ্যস্থিত তরল পদার্থ বরফে পরিণত হয় ফলে কম পরিমাণে পুষ্টি পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং বরফের মধ্যে আটকা পড়ে।
- খুব তাড়াতাড়ি অণুবীক্ষণিক জীবের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়।
- থইং (thawing) এর ফলে পুর্বের কোষগুলো পুর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

> **রেফ্রিজারেশন (Refrigeration)**
> একটি বন্ধ ঘরে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করে চিংড়ি বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের তাপমাত্রা কমিয়ে তাদেরকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে রেফ্রিজারেশন বলে।

হিমায়ক যন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of freezer)

মাছ বা চিংড়ি হিমায়িতকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্র বা ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি হিমায়ক যন্ত্রের বিবরণ দেয়া হলোঃ

১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার (Air Blast Freezer- ABF)
২. কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার (Contact Plate Freezer- CPF)
৩. ইমারসন ফ্রিজার (Immersion Freezer- IF)
৪. সার্প ফ্রিজার (Sharp Freezer- SF)

৫. অন্যান্য ফ্রিজার (Other Freezers)

১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার (Air blast freezer)

যে হিমায়ক যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের বাষ্প প্রবাহিত করে চিংড়ি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে হিমায়িতকরণ করা হয় তাকে এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার বলে। এটি দু' প্রকার-

ক) সার্বক্ষণিক ফ্রিজার (Continuous freezer): এতে হিমায়িতকরণের সময় উৎপাদ (product) ঘুরতে থাকে। যেমন- হিমাগারের ভিতর এক পাশ দিয়ে চিংড়ি ঢোকানো হয় এবং অন্য পাশ দিয়ে বের করা হয়।

খ) ব্যাচ ফ্রিজার (Batch freezer): এর ভিতর উৎপাদ স্থির থাকে। যেমন- হিমাগারের ভিতর এক ব্যাচ চিংড়ি ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ধরে রেখে দেয়া হয়।

বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের হিমায়িতকরণ পদ্ধতি: এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে সাধারণত সুড়ঙ্গ পথযুক্ত একটি পৃথককৃত ঘর, যার মধ্যে ইভাপোরেটরের উপর দিয়ে এক বা একাধিক ফ্যানের মাধ্যমে উৎপন্ন বায়ু (অ্যামোনিয়া-NH_3), ঠান্ডা লবণ পানি বা রেফ্রিজারেন্ট (refrigerant) ১২ বা ২২ ঘন্টা দিয়ে ঠান্ডা করা হয়। যে দ্রব্যকে হিমায়িতকরণ করা হবে তার চারপাশে দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। এই ফ্রিজারের পৃথককৃত ঘরের মধ্যে সাধারণত একবারেই সম্পূর্ণরূপে সেলফের র‍্যাকে চিংড়ি ভর্তি করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে র‍্যাককে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় অথবা স্থির রাখা হয়। সাম্প্রতিককালে উন্নত ফ্রিজারে চিংড়ি উৎপাদকে সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করানোর জন্য কনভেয়ার ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের অধিকাংশ ফ্রিজারে তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি সে. থেকে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সে. এর মধ্যে রাখা হয়। অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুবিধাজনক হিমায়িতকরণ করানোর জন্য উৎপাদের উপর দিয়ে এই ঠান্ডা বাতাস প্রবাহের গতি সাধারণত ৫০০-১০০০ এফপিএম (ফুট পার মিনিট) এর মধ্যে রাখা হয়। এরূপ ফ্রিজারের হিমায়িতকরণ করতে সময় লাগে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা।

২. কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার (Contact Plate Freezer- CPF)

এই হিমায়ক যন্ত্রে চিংড়িকে প্লেটের উপর রেখে ধীরে ধীরে হিমায়িতকরণ করা হয়। এরূপ ফ্রিজারে চিংড়িকে ফাঁপা ধাতুর প্লেটের মধ্যে রাখা হয়, যার ভিতরে যে কোন একটি রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করানো হয়। এটি দু' প্রকার-

ক) আনুভূমিক কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার: এতে ট্রের মধ্যে বসানো চিংড়ির চ্যাপ্টা প্যাক ব্যবহার করা হয়।

খ) উলম্ব কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার: প্রধানত বড় ধরনের ব্লক তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বাণিজ্যিক পদ্ধতি: কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজারের একটি কেবিনে বা ঘরের চলাচলক্ষম আনুভূমিক প্লেটগুলোর উলম্বভাবে গাদা দেওয়া থাকে। প্লেটগুলোকে সংযুক্ত পথের মাধ্যমে ঠান্ডা লবণ পানি, NH_3 বা রেফ্রিজারেন্ট ১২ বা ২২ ঘন্টা দিয়ে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের ফ্রিজার গাটবন্দী (packaged) মৎস্য উৎপাদের জন্য উপযুক্ত। প্রতিটি ব্লক চিংড়িসহ ৫০-৬০ মিলিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্লকের তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি সে. হয়ে থাকে। মৎস্য উৎপাদকে তাড়াতাড়ি ফ্রিজিং করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

৩. ইমারসন ফ্রিজার (Immersion Freezer- IF)

এ ক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রার তরল পদার্থ উৎপাদকে ডুবানো বা নিমজ্জন করা হয়। এ ধরনের ঠান্ডা তরল পদার্থের মধ্যে চিংড়িকে রেখে সরাসরি তার দেহের তাপমাত্রা কমানোর পদ্ধতি এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের ঠান্ডা বাতাস থেকে উৎকৃষ্ট। পানি থেকে এই ধরনের তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েন্ট বেশি হয়ে থাকে।

৪. সার্প ফ্রিজার (Sharp Freezer- SF)

সার্প ফ্রিজার একটি পৃথককৃত ঘর এবং সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সে.রাখা হয়। এখানে একাধিক পাইপের কয়েল দিয়ে তৈরি সেলফ রাখা হয়। যার ভিতর দিয়ে ঠান্ডা লবণ পানি, NH_3 অথবা অন্যান্য রেফ্রিজারেন্টকে প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে চিংড়িকে হিমায়িতকরণের সময় সরাসরি সেলফে রক্ষিত প্লেটের উপর রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদের সব অংশ পাইপের সংস্পর্শে থাকতে পারে না । এই পদ্ধতি অনেক পুরাতন বলে বর্তমানে এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত।

৫. অন্যান্য ফ্রিজার

তরল নাইট্রোজেনের হিমায়িতকরণ তাপমাত্রা মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সে.। তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করেও চিংড়ি/ মাছ হিমায়িত করা হয়।

তাজা বা টাটকা চিংড়ি বা মাছ হিমায়িতকরণের সময় সৃষ্ট সমস্যাসমূহ-

- ক) জারণের ফলে নষ্ট হওয়া;
- খ) পানি বের হয়ে যাওয়া;
- গ) ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাওয়া;
- ঘ) অটোলাইসিসের সমস্যা;
- ঙ) প্রোটিন ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়া; এবং
- চ) আণুবীক্ষণিক জীবের সমস্যা ইত্যাদি।

২০২৫

ফ্রিজার বার্ন (Freezer burn): এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের ঠান্ডা বাতাসের গতিবেগ ৫০০ এফপিএম এর নিচে হলে চিংড়ির উপর একটি সাংঘাতিক ধরনের প্রভাব পড়ে। এ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবকে ফ্রিজার বার্ন বলে। এই অবস্থায় চিংড়ির পারিপার্শ্বিক বাষ্পের চাপ কমে যায়, ফলে চিংড়ির দেহ থেকে পানি বের হয়ে যেতে থাকে এবং চিংড়ি শক্ত হয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ ছাড়া চিংড়ির বর্ণ, গঠন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়।

গ্লেজিং (Glazing) : এটি ফ্রিজার বার্ন থেকে চিংড়িকে রক্ষা করার একটি পদ্ধতি। চিংড়ির দেহ থেকে যাতে সহজে পানি বের হয়ে যেতে না পারে, সেজন্য এই প্রক্রিয়ায় চিংড়ির দেহের চারপাশে বরফের একটি আস্তরণ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় খুবই অল্প সময়ের জন্য খুব নিম্ন তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প দ্রবণে চিংড়িকে ডোবানো হয়। ফলে চিংড়ির দেহের চারিদিকে বরফের একটি আস্তরণ পড়ে এবং চিংড়ির দেহ থেকে পানি বের হতে বাধা পায়।

থইং (Thawing): থইং হলো হিমায়িতকরণের পরের একটি পরিচর্যা যাতে চিংড়ির দেহে কোথাও কোন বরফ থাকে না। এরুপ অবস্থা তখনই ঘটে যখন চিংড়ির দেহের সর্বত্রই তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সে. এর উপরে থাকে।

চিংড়ি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিং এর গুরুত্ব

চিংড়ি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। চিংড়ি পণ্যকে বাতাসের আর্দ্রতা, পোকা-মাকড়, ধুলা- বালি ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই ভালভাবে প্যাকেজিং করা উচিত। ভাল প্যাকেজিং করে না রাখলে চিংড়ি পণ্যের গুণগতমান অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতের জন্য উন্নত প্যাকেজিং এর গুরুত্বসমূহ হলো-

ক) প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের মানের একটা প্রতিচ্ছবি ক্রেতা/বিক্রেতার নিকট ভেসে উঠে।

খ) প্যাকেজিংয়ের ধরন থেকে অতি সহজেই বুঝে নেয়া যায় পণ্যটি কত ভালভাবে সংরক্ষণ করা আছে বা সংরক্ষিত থাকবে।

গ) ভালভাবে প্যাকেজিং করা থাকলে বিক্রেতা পণ্যটি সুবিধামত স্থানে ও সুবিধামত সময়ে বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করতে পারে।

ঘ) ক্রেতাও সব সময় ভাল প্যাকেজিং করা পণ্য ক্রয় করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

প্যাকেজিংয়ে লেবেল ব্যবহারের গুরুত্ব

ক) প্যাকেজিংয়ের লেবেলের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের মানের একটা প্রতিচ্ছবি ক্রেতা/ বিক্রেতার নিকট ভেসে উঠে।

খ) প্যাকেজিংয়ের লেবেলের বর্ণনা থেকে অতি সহজে বুঝে নেয়া যায় পণ্যটির গুণগতমান, পুষ্টিগুণ ও এর মেয়াদ সম্পর্কে।

গ) ভালভাবে প্যাকেজিং ও লেবেলিং করা থাকলে ক্রেতা সব সময় পণ্য ক্রয় করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

ঘ) ট্রেসেবিলিটি লেবেল থাকলে পণ্যের পরিপূর্ণ ইতিহাস সহজেই জানা সম্ভব হয়।

প্যাকেজিং ও লেবেলিং এবং উৎপাদনকারী শনাক্তকরণ

ক) প্যাকেজিং ও লেবেলিং ঠিক থাকলে চিংড়ি পণ্যের গুণগত মানের জন্য উৎপাদনকারীকে দায়ী করা সম্ভব হয়।

খ) প্যাকেজিংয়ের লেবেল থেকে উৎপাদনকারীকে শনাক্ত করা যায়।

গ) উৎপাদনকারীকে শনাক্ত করা গেলে পণ্যের গুণগতমানের দায়ভার উৎপাদনকারীর ওপর বর্তানো সহজ হয়।

ঘ) যেহেতু ট্রেসেবিলিটি (traceability) লেবেল অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইতিহাস রাখা আস্তে আস্তে বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে, সেহেতু উৎপাদনকারীকে বা আরো নিচের দিকে চাষি বা হ্যাচারি মালিককেও শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

ট্রেসেবিলিটি লেবেলে সাধারণত যে সকল তথ্য থাকা উচিত সেগুলো হলো-

ক) মা-চিংড়ি সম্পর্কিত তথ্য, যথা- ধরার তারিখ, ধরার প্রকৃতি ও ধরার পরে ব্যবহৃত খাদ্য/ঔষধের বিবরণ।

খ) সকল গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

গ) চিংড়ি পোনা সম্পর্কিত তথ্য, যথা- হ্যাচিং এর তারিখ, ট্যাংকের নম্বর ও খাদ্য/ঔষধসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

ঘ) চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত তথ্য, যথা- মজুদের তারিখ, পুকুর নম্বর ও খাদ্য/ঔষধসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

ঙ) চিংড়ি ডিপো/মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কিত তথ্য, যথা- ধরার/সংগ্রহের তারিখ, অবস্থানের মোট সময় ও গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

চ) চিংড়ি ডিপো/মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কিত তথ্য, যথা- ধরার/সংগ্রহের তারিখ, অবস্থানের মোট সময় ও গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

ছ) চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্য, যথা- চিংড়ি গ্রহণের তারিখ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও স্টোরেজসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তারিত তালিকা।

প্যাকেজিং ও লেবেলিংয়ের সহিত পণ্যের মান বাড়ার সম্পর্ক

ক) প্যাকেজিং ও লেবেলিং ঠিক থাকলে, লেবেলিংয়ে উৎপাদনকারীর পরিচয় থাকে ফলে উৎপাদনকারীর নিজস্ব দায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায় ও পণ্যের মান বাড়াতে সহায়তা করে।

খ) উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের লেবেলে তাদের নাম ঠিকানা ব্যবহার করলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করা ও ব্যবসায়িক সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান বাড়াতে সদা সচেষ্ট থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতের জন্য উন্নত প্যাকেজিং সরঞ্জাম হিসেবে পলিথিন জাতীয় সরঞ্জামের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং সরঞ্জাম হিসেবে পলিথিনের ব্যবহারের সাথে সাথে পলিথিন সিলারের ব্যবহারের ব্যাপকতা বাড়ছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার পলিথিন সিলারও এখন বাজারে পাওয়া যায়। পলিথিন জাতীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে-

সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক) সহজপ্রাপ্যতা ও মূল্য কম হওয়া

খ) স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় প্রকার প্রাপ্যতা

গ) বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির প্রাপ্যতা

ঘ) লেবেল প্রিন্ট করার সুযোগ থাকা

ঙ) আর্দ্রতা প্রতিরোধক হওয়া

চ) টেকসই হওয়া

অসুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক) পরিবেশবান্ধব না হওয়া।

খ) কোন সরু দ্রব্য, সূচ ও ধারালো জিনিস যেমন, চাকু, পিন ইত্যাদির সংস্পর্শে আসলে সহজেই ছিদ্র হওয়া বা কেটে যাওয়া।

গ) মজুদের সময় উপরে অবস্থিত প্যাকেটের পণ্যের চাপ সরাসরি নিচের প্যাকেটের পণ্যের উপর পড়ে।

পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সাদা প্লাস্টিক পাত্রের ব্যবহার-

ক) পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পাত্র হিসেবে প্রচলিত সাদা প্লাস্টিকের বৈয়মের ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) পরীক্ষামূলকভাবে বেশকিছু সাদা প্লাস্টিকের বৈয়মের ব্যবহার করে শুটকি বাজারজাত করে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে।

গ) চিংড়ি পণ্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করতে হলে বৈয়মের আকার আকৃতি পরিবর্তন করে চিংড়ি পণ্যের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণ

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্যের খবর ক্রেতার নিকট পৌছানো অতি জরুরি। চিংড়ি পণ্যের ভোক্তারা সাধারণভাবে চিংড়ি পণ্যের স্বাদের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। চিংড়ি পণ্যের সকল ক্ষেত্রে হ্যাসাপ মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি কিনা সে ব্যাপারে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিংড়ি পণ্য বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়েও গুণগতমান হারাতে পারে। চিংড়ি পণ্য বাজারজাত করার জন্য স্থানান্তরের সময় বা বাজারজাতের পরে বিক্রেতার দোকানে অসাবধানতার কারণে চিংড়ি পণ্যের প্যাকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও চিংড়ি পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হতে পারে। দোকানে দীর্ঘ দিন অবিক্রিত রয়ে গেলে চিংড়ি পণ্যের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। কাজেই বাজারজাতকরণের সময়ে ও তৎপরবর্তী বিক্রয়ের সময়ে বিশেষভাবে চিংড়ি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্যের খবর অতি দ্রুত ক্রেতার নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দেশে ও বিদেশে চিংড়ি পণ্য বিপণনে বিজ্ঞাপন প্রচারসহ মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।

হ্যাসাপ (HACCP) ভিত্তিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানার মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব

বিগত কয়েক দশকে উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত খাদ্যের প্রধান শর্ত হলো গুণগত মানসম্পন্ন হওয়া। ১৯৯০ এর শুরুতে হ্যাসাপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়িজাত খাদ্যের মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মৎস্যজাত খাদ্যে যে জীবাণুগত সমস্যা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে তা মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা সহজ হবে। এই হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১০০ ভাগ খাদ্যসামগ্রীকে অণুজীবঘটিত রোগের সংক্রমণ থেকে রোধ করা সম্ভব। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ খাদ্য ভোক্তাদের কাছে পৌছার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করেন যে, খাদ্য উৎপাদনের উৎসস্থল থেকে যে সকল কারণে খাদ্য সংক্রমিত হচ্ছে তা নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবন উপহার দেয়া সম্ভব।

চিংড়ির উত্তম ব্যবস্থাপনা

খাদ্য যাতে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ সংস্থা হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গুণগতমান উন্নয়ন করে থাকে। ভালো প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা GMP (Good Manufacturing Practice) এর মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন হয়। GMP এর অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে বাস্তবায়ন করতে হয় যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পণ্য সামগ্রী ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হ্যাসাপ

হ্যাসাপ হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিধি-বিধান, যা কোন খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, বিপণন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের মূল্য সংযোজিত চিংড়ি পণ্যের প্রধান ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোসহ অন্যান্য উন্নত দেশ। এ সকল দেশের মূল্য সংযোজিত চিংড়ি পণ্য আমদানির প্রধান শর্ত হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের সর্বস্তরে হ্যাসাপ-এর বিধিবিধান বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানাগুলোতে হ্যাসাপ বিধি-বিধান মানা হচ্ছে।

হ্যাসাপ এর প্রধান দিকগুলো হল মানুষ বা অন্য কোন জীব বা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে এমন কোন ক্ষতিকারক উপাদান বা কার্যক্রম প্রতিহত করা বা সম্ভব না হলে যতদূর সম্ভব কমানো। যে সকল উপাদান বা কার্যক্রম ক্ষতির কারণ হতে পারে তাদেরকে হ্যাজার্ড বলে। হ্যাজার্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই সকল বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। হ্যাজার্ডসমূহকে প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়-

ক. জৈবিক হ্যাজার্ড: ক্ষতিকারক অণুজীব, বিশেষ করে মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মূলত প্রাথমিকভাবেই হ্যাসাপের প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরো অন্যান্য দিক সংযোজিত হয়ে হ্যাসাপের কলেবর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত জৈবিক হ্যাজার্ড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জৈবিক হ্যাজার্ড আবার বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। হিমায়িত পণ্যের জন্য এক রকম, কৌটাজাত পণ্যের জন্য অন্য রকম বা খাবার উপযোগী পণ্যের জন্য সেটা ভিন্ন রকম। চিংড়ি বা মাছের পরজীবী, যথা- নেমাটোডস (গোল কৃমি), সেসটোডস (ফিতা কৃমি), ট্রেমাটোডস (ফ্লুকস) ইত্যাদির উপস্থিতিও এক ধরনের জৈবিক হ্যাজার্ড।

খ. রাসায়নিক হ্যাজার্ড: ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- এন্টিবায়োটিক ও কীটনাশকই বাংলাদেশী মৎস্য পণ্যের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিছু কিছু ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ উচ্চ তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ির দেহ পচনের ফলে তৈরি হয়। ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে স্কমব্রো টক্সিন বা হিস্টামিন

২০২৫

ফরমেশন বলে, ফলে ঐ সমস্ত চিংড়ি বা মাছ খেলে এলার্জি জনিত কারণে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এন্টিবায়োটিক সাধারণত প্রক্রিয়াজাতকারীরা ব্যবহার করেন না। এন্টিবায়োটিক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের খামারে। মাছের ট্রলার থেকে চিংড়ি আহরণ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় আনার সময় রাসায়নিক দ্রব্য কিংবা ডিজেলের মিশ্রণের ফলেও চিংড়ির মান ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

গ. ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড: ক্ষতিকারক কোন বস্তু, যেমন- আলপিন, পেরেক, কাঁচের ভাঙ্গা টুকরা ইত্যাদি হ্যাজার্ডকে ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড বলে। প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এ সমস্ত ক্ষতিকারক বস্তুর সংমিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. পরিবেশগত হ্যাজার্ড: পরিবেশের জানা ক্ষতিকারক বস্তু বা কার্যক্রম, যেমন- ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চিংড়ি চাষ বা মাছ চাষ, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির দূষণ ইত্যাদি হ্যাজার্ডকে পরিবেশগত হ্যাজার্ড বলে।

চিংড়ি দূষণের উৎস শনাক্তকরণ

নিম্নলিখিত উৎস থেকে চিংড়িতে দূষণ হতে পারে-

ক) সংক্রমণযুক্ত মা চিংড়ির ব্যবহার।
খ) সংক্রমণযুক্ত লার্ভি/পিএল ব্যবহার।
গ) চাষের জলাশয় বা তার আশপাশের পরিবেশ থেকে সংক্রমণ।
ঘ) চিংড়ি চাষের সময় খাদ্য/ঔষধ ইত্যাদি থেকে সংক্রমণ।
ঙ) চিংড়ি আহরণের ও বাজারজাতকরণের যে কোন পর্যায়ে সংক্রমণ।

চিংড়ির দূষণের উৎস থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

ক) কোন প্রকার ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হলে সেই মা-চিংড়ি কোন অবস্থাতেই চিংড়ির পোনা তৈরির জন্য হ্যাচারিতে ব্যবহার করা চলবে না।
খ) হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য এমন মা-চিংড়ি ব্যবহার করতে হবে যাহা নিশ্চিতভাবে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত নয়।
গ) চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত লার্ভি/পিএল অবশ্যই সর্বপ্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অণুজীব দ্বারা কোন পর্যায়ে সংক্রমিত নয় তা নিশ্চিত হতে হবে।
ঘ) চিংড়ি চাষের জন্য পিএল নির্বাচনের পূর্বে নিশ্চিতভাবে পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হবে যে চাষের জন্য নির্বাচিত পিএল সর্বপ্রকার ভাইরাসমুক্ত।

ঙ) চিংড়ি চাষ করতে গিয়ে তার আশেপাশের কোন জলাশয় বা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না বা আশেপাশের কোন জলাশয় বা পরিবেশ থেকে কোন ক্ষতিকর বস্তুর জলাশয়ে প্রবেশ রোধ করতে হবে।

চ) চিংড়ি চাষের জলাশয় থেকে বা তার আশপাশের পরিবেশ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছ) চাষের সময়ে চিংড়িকে যে খাদ্য দেয়া হয় বা যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তা থেকেও চিংড়িতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব সংক্রমিত হতে পারে। সেজন্য চিংড়ি চাষের সময় খাদ্য/ঔষধ ইত্যাদি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ) চিংড়ি চাষের পর আহরণ ও বাজারজাতকরণের সময়েও বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। সেজন্য চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণের কোন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ

১. মিথিলিন ব্লু (Metheline blue)
২. ট্রাফলান (Treflan)
৩. প্রোটোজোয়াসাইড (Protozoacide)
৪. ফরমালিন (Formalin)
৫. জুথামনিসাইড (Zoothamnicide)
৬. ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder)
৭. কপার সালফেট (Copper sulfate)
৮. ম্যালাকাইট গ্রীন (Malachite green) ইত্যাদি

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিকসমূহ

১. সিপরোফ্লোক্সাসিন (Ciprofloxacin)
২. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin)
৩. কেনামাইসিন (Kanamycin)
৪. ইরাইথ্রোমাইসিন (Erythromycin)
৫. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytetracycline)
৬. অক্সোলিনিক এসিড (Oxolinic acid)
৭. অ্যালবাজিন (Albazin)

২০২৫

নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসমূহ

১. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)

২. নিওমাইসিন (Neomycin)

৩. নাইট্রোফিউরান মেটাবোলাইট (Nitrofuran metabolite)

কার্যকর এন্টিবায়োটিকসমূহ

Erythromycin, Ciprofloxacin etc.

অকার্যকর এন্টিবায়োটিকসমূহ

Chloramphenicol, Nalidixic acid, Amoxicillin, Kanamycin, Neomycin, Ampicillin ete.

নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

ক. জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

১) মানবদেহে নানা রকম ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমে গেছে, অনেক এন্টিবায়োটিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২) কেবলমাত্র প্রয়োজন হলেই চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

৩) প্রায়শই দেখা যায় যে, সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া শনাক্ত না করেই এবং কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি (sensitivity) পরীক্ষা ছাড়াই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪) এন্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার এন্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্স (resistance) সৃষ্টি হচ্ছে। এন্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার হ্যাচারি কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুকির কারণ হচ্ছে, মানবদেহেও ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে।

জলজ জীবের ওপর প্রভাব

১) হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের বর্জ্য জলজ পরিবেশ ও সমুদ্রে যায়, যা পানি দূষণ সৃষ্টি করে থাকে।

২) পানি দূষণের মাধ্যমে জলজ অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যহত করে, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রভাব

৩) চিংড়ি উৎপাদনের কোন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে এবং চিংড়ির মাংসপেশীতে এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ (residue) থাকলে সেই চিংড়ি পণ্য রপ্তানি করা যাবে না।

৪) এ অসাবধানতার কারণে আমদানীকারক বিভিন্ন দেশ থেকে চিংড়ি কন্টেইনার দেশে ফেরৎ আসতে পারে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

অনেকক্ষেত্রেই চিংড়িতে দুষণ একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। কাজেই দুষণের সম্ভাব্য কারণসমূহ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে চাষ এলাকার যেকোন একটি বাগদা চিংড়ির খামার পরিদর্শন করো। খামার ভালোভাবে পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছক পুরণ করো-

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
পরিদর্শনকৃত চিংড়ি খামারের নাম	
খামারের অবস্থান বা ঠিকানা	
জলাশয়ের ভৌত অবস্থা	১. ২. ৩.
পানির প্রধান উৎস	১. ২. ৩.
খামারে কর্মরত কর্মীগণ কর্তৃক কাজের সময় ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলোর নাম	১. ২. ৩. ৪. ৫.
পরিদর্শনকৃত খামারটির দুষণমুক্তকরণে ৫টি পরামর্শ প্রদান কর	১. ২. ৩. ৪. ৫.

নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

২০২৫

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

চিংড়ি আহরণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করো।

ক্রমিক	আহরণ সরঞ্জামের ধরন	সরঞ্জামের নাম	প্রাপ্তিস্থান
১.	ফাঁদ		
২.	জাল		

জব ১: বাগদা চিংড়ি আহরণ কৌশল পর্যবেক্ষণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী মাছ ধরার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের বালতি/ গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	হাফ ড্রাম	২৫ লিটার	১টি
০৩	ঝাঁকি জাল	মাঝারি আকারের	১টি
০৪	বেড় জাল	মাঝারি আকারের	১টি
০৫	বাঁশের চাঁই	মাঝারি আকারের	৩টি
০৬	পাম্প মেশিন	২ অশ্ব শক্তি	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০২	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৩	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৪	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

ক. আংশিক আহরণ

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত চিংড়ি চাষ পুকুরে গমন করো।

২. অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় চিংড়ি আহরণ সহজ হয় বিধায় দিন ও সময় অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা তিথির সাথে সমন্বয় করে নির্ধারণ করো।

৩. অতঃপর পানি সরবরাহ গেটের কাছে সন্ধ্যার সময় চাঁই স্থাপন করো।

৪. পরবর্তী দিন সকালে পানি থেকে চাঁই পাড়ে উঠিয়ে চাঁই থেকে বড় আকারের (৬০-৮০ গ্রাম) বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখো। ছোট ছোট চিংড়িগুলো পুনরায় পানিতে ছেড়ে দাও।

৫. পুকুরের যেসব স্থানে সম্পুরক খাদ্য দেয়া হয় সেসব স্থান থেকেও সকাল বা সন্ধ্যা বেলায় ঝাকি জাল দিয়ে বড় আকারের চিংড়ি সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখো।

৬. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

খ. সম্পূর্ণ আহরণ

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত চিংড়ি চাষ পুকুরে গমন করো।

২. একটি বেড় জাল দিয়ে যতটা সম্ভব চিংড়ি ধরে ফেলো।

৩. এরপর পাম্প মেশিন দিয়ে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করে ফেলো।

৪. অতঃপর হাত দিয়ে ছোট-বড় সব চিংড়ি ধরে ফেলো।

৫. আহরিত চিংড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঝুড়িতে ঠান্ডা স্থানে রাখো।

৬. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- আহরিত চিংড়ির গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সূর্যালোকের নিচে রাখা উচিত নয়।

আত্মপ্রতিফলন

বাগদা চিংড়ি আহরণ কৌশল পর্যবেক্ষণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২ : আহরিত বাগদা চিংড়ি বাছাইকরণ কৌশল অনুশীলনে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী চিংড়ি বাছাইকরণের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস, মেশিন)

ক্রমিক	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের বালতি/ গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	হাফ ড্রাম	২৫ লিটার	১টি
০৩	পরিষ্কার পানি	স্থানীয় উৎসের নিরাপদ পানি	১৫ লিটার
০৪	বরফ মিশ্রিত পানি	স্থানীয় উৎসের নিরাপদ পানি	১৫ লিটার
০৫	বাঁশের চাটাই বা হোগলা	মাঝারি আকারের	১টি
০৬	ট্রে	স্টেইনলেস স্টিল	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৩	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত চিংড়ি চাষ পুকুরে গমন করো।
২. চিংড়ি ধরার পর পরই ছায়াযুক্ত স্থানে বাঁশের চাটাই বা হোগলার উপর রাখো।
৩. অতঃপর চিংড়িগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করো।
৪. পরিষ্কার পানিতে ধোয়ার পর চিংড়িগুলো এবার ড্রামের মধ্যে বরফ মিশ্রিত পানিতে রাখো।
৫. অতঃপর চিংড়িগুলোকে বরফ পানি থেকে উঠিয়ে ট্রেতে রাখো।
৬. এর পর চিংড়িগুলো বিভিন্ন গ্রেডে বাছাই করো। এবং গ্রেড অনুযায়ী চিংড়িগুলো বিভিন্ন ট্রেতে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও।
৭. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- তাপমাত্রা বেশি থাকলে চিংড়ি আহরণের প্রথম ৩ ঘন্টার মধ্যেই চিংড়ির গুণগত মানের বেশ অবনতি ঘটে। এ অবস্থা রোধকল্পে অল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণপূর্বক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য চিংড়ির বাছাইকরণ বা গ্রেডিং যথাযথভাবে করতে হবে। এজন্য আহরিত চিংড়ি খামারে সঠিকভাবে গ্রেডিং করে বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

আহরিত বাগদা চিংড়ি বাছাইকরণ কৌশল অনুশীলনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩ : আহরিত বাগদা চিংড়ির বরফায়ন ও প্যাকিং কৌশল অনুশীলনে দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী বরফায়ন/প্যাকিং সরঞ্জাম সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা।
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

২০২৫

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	তাপ নিরোধক পাত্র	১৫ লিটার	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	চিংড়ি	পুকুরে থেকে সদ্য আহরিত	১০ কেজি
০২	পরিষ্কার পানি	স্থানীয় উৎসের নিরাপদ পানি	১৫ লিটার
০৩	বরফ মিশ্রিত পানি	স্থানীয় উৎসের নিরাপদ পানি	১৫ লিটার
০৪	বরফ	নিরাপদ পানি থেকে উৎপাদিত	৩০ কেজি
০৫	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি
০৬	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৭	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত চিংড়ি চাষ পুকুর/বাজারে গমন করো।
২. নিকটস্থ খামার বা বাজার থেকে ভালমানের কিছু চিংড়ি সংগ্রহ করো।
৩. অতঃপর বরফ মিশ্রিত পানি দিয়ে চিংড়িগুলো ধৌত করো।
৪. তাপ নিরোধক পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ সাজানোর পর তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাও। এভাবে এক স্তর বরফ ও এক স্তর চিংড়ি সাজাও। মনে রাখতে হবে উল্লিখিত পাত্রে ২ ফুটের বেশি উচ্চতায় যেন চিংড়ি সাজানো না হয়।
৫. পাত্রে চিংড়ি সাজানো হলে পাত্রের মুখটি তাপ নিরোধক ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দাও।
৬. এর পর চিংড়িগুলো বিভিন্ন গ্রেডে বাছাই করো। এবং গ্রেড অনুযায়ী চিংড়িগুলো বিভিন্ন ট্রেতে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও।
৭. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো এবং প্যাকিং কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিংড়ি সংরক্ষণ না করলে চিংড়ির ঈপ্সিত মূল্য পাওয়া যায় না। এজন্য একই প্রজাতির ও একই আকারের শক্ত খোলস বিশিষ্ট, দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই এবং পরজীবিমুক্ত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে।
- চিংড়ির গুণগতমান আহরণ পরবর্তী সময় ও তাপমাত্রার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাই অল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণ করে মাথাসহ পরিবহণ করা অধিক উত্তম।

আত্মপ্রতিফলন

আহরিত বাগদা চিংড়ির বরফায়ন ও প্যাকিং কৌশল অনুশীলনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী ৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খুলনা অঞ্চলে সাধারণত কোন সময় চিংড়ি আহরণ করা হয়?
২. চিংড়ি আহরণ উপকরণকে এক কথায় কি বলা হয়?
৩. বেহুন্দি জালের স্থানীয় নাম কি?
৪. কত ওজনের চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য লাভজনক?
৫. আহরণকৃত চিংড়ি বরফ মিশ্রিত পানিতে কত সময় ডুবিয়ে রাখতে হয়?
৬. পরিবহণ সময় ১২-১৮ ঘন্টা হলে বরফ ও চিংড়ি ব্যবহারের অনুপাত কত হবে?
৭. বিপণন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী কাদের বলা হয়?
৮. ক্লোরামফেনিকল কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক?
৯. একটি জৈবিক ও একটি ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডের নাম লিখ?
১০. রাসায়নিক হ্যাজার্ড মূলত কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে আংশিক আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
২. চিংড়ি আহরণোত্তর পরিচর্যা বর্ণনা করো।
৩. বাংলাদেশে চিংড়ি বিপণনে প্রধান সমস্যাসমূহ উল্লেখ করো।
৪. পচন ক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ির কোন কোন গুণাবলী নষ্ট হয়?
৫. মাছ/ চিংড়ির পচন রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর নাম লিখ?
৬. কী কী উপায়ে মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণ করা যায়?
৭. হ্যাসাপ কয়টি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়?
৮. ট্রেসেবিলিটি কি?
৯. কার্যকর এন্টিবায়োটিকসমূহ কী কী উল্লেখ করো।
১০. দ্রুত হিমায়িতকরণ বলতে কী বুঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
২. বাগদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৩. চিংড়ির গুণগতমাণ অক্ষুন্ন রাখার কৌশল বর্ণনা করো
৪. মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা করো।
৫. চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে হ্যাজার্ডসমূহ বর্ণনা করো।

সমাপ্ত

২০২৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি